স ম্পূ র্ণ উ প ন্যা স

# ডায়েরির সঙ্কেত

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

এত তাড়াতাড়ি সন্ধে নেমে যাবে, ভাবতে পারেনি ঝিনুক। গাড়ির পিছনের সিটে বসে ড্রাইভার আশুদাকে বলে, "মা যা-ই জিজ্ঞেস করুক, একদম মুখ খুলবে না।"

সঙ্গে-সঙ্গে নব্বই ডিগ্রি মাথা হেলায় আশুদা। ঝিনুকদের অনেকদিনের ড্রাইভার। এরকম নিরীহ ভালমানুষ কলকাতায় খুব কমই পাওয়া যায়।

www.boierpathshala.blogspot.com

মুর অ্যাভিনিউ ছেড়ে চণ্ডী ঘোষ রোডে ঢুকেই ঝিনুকদের একতলা বাড়ি। ড্রয়িংরুমের জানলা খোলা। আলো এসে পড়েছে বাগানে। শীতের সন্ধেতে জানলা খোলা মানে দীপকাকু এসেছেন। দাবা খেলছেন বাবার সঙ্গে। সিগারেটের ধোঁয়া বের হওয়ার জন্য খুলে রাখা হয়েছে জানলা।

এ সময় দীপকাকুর উপস্থিতি মোটেই কাম্য নয়। অবশ্য দীপকাকুর কোনও সময়-অসময় নেই, যখন ইচ্ছে চলে আসেন দাবা খেলতে। তিনি আবার নাকি ডিটেকটিভ। আজ পর্যন্ত কোনও উল্লেখযোগ্য কেস সল্‌ভ করেছেন বলে শোনেনি ঝিনুক। নিজের কাজ নিয়ে দীপকাকু যে হতাশ, সেটা তাঁর আচরণে বেশ ফুটে বেরোয়।

মিলিটারি থেকে রিটায়ার করার পর বাবার ব্যবসাটা এখন শখের। অফিস যাওয়ার কোনও নির্দিষ্ট সময় নেই। বয়সের যথেষ্ট তফাত হলেও দু'জনের জমে খুব।

বাগানের গেটে গাড়ি দাঁড়াতেই খুলে গেল মেন দরজা। অত দূর থেকেই মা উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইলেন, "কী রে, এত দেরি হল কেন?"

উত্তরটা ড্রয়িংয়ে এসে দিল ঝিনুক, "আর বোলো না, আধঘণ্টার উপর পাওয়ার অফ ছিল ক্লাসে। কেব্‌ল ফল্ট। কারেন্ট আসার পর সব কম্পিউটার স্টেডি করে পুরো ক্লাস নিয়ে ছাড়লেন স্যার।"

"একটা ফোন করলে পারতিস।" বললেন মা।

জুতো খুলে র‍্যাকে রাখতে-রাখতে ঝিনুক বলে, "কী ফোন করব, ভাবছি এই হয়তো চলে আসবে কারেন্ট।"

"ওটা বোধহয় কেব্‌ল ফল্ট ছিল না।" দাবার বোর্ডের দিকে চোখ রেখে বললেন দীপকাকু।

"মানে!" ঝিনুকের মুখে বিরক্তি মেশানো বিস্ময়।

"আধঘণ্টার মধ্যে ইলেকট্রিশিয়ান ডেকে কেব্‌ল সারানো

*ছবি: সুব্রত চৌধুরী*

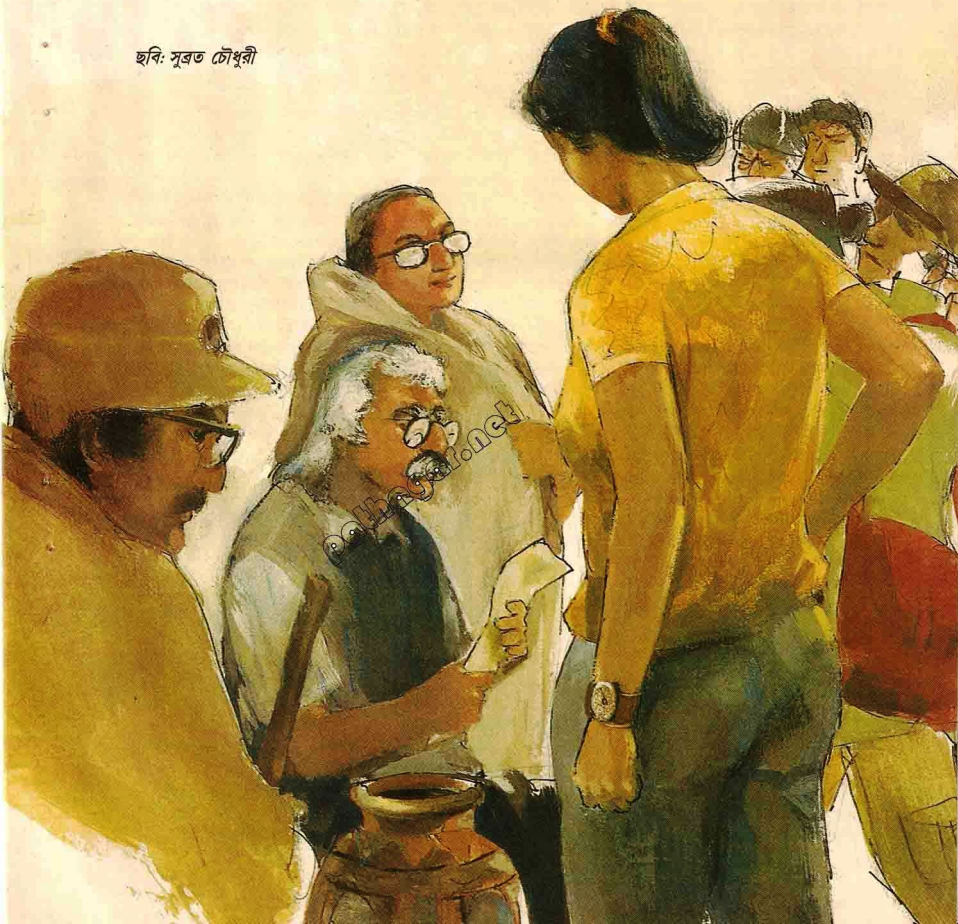

কলকাতার পক্ষে একটু বাড়াবাড়ি।"

দীপকাকুর মন্তব্যে ঝিনুক বলে, "আমি তো আর ঘড়ির দিকে চোখ রেখে বসেছিলাম না। ওটা একঘন্টাও হতে পারে।"

"আর ওই সময়টুকু তোমরা কম্পিউটার ক্লাসে ব্যয় না করে গড়িয়াহাটে নেল পলিশ কিনতে চলে গেলে।"

অন্য যে কেউ হলে এ সময় ভীষণ চমকে যেত। ঝিনুক ততটা চমকাল না। দীপকাকুর এই ক্ষমতার বেশ কিছু নমুনা সে আগেও দেখেছে। শুধু খারাপ লাগে, বিশেষ গুণটা যখন তার উপর ব্যবহৃত হয়। একেই বোধহয় বলে ক্ষমতার অপব্যবহার। কিন্তু এত সহজে ধরা দিলে তো চলবে না। পালটা যুক্তি দেয় ঝিনুক, "আপনি বোধহয় জানেন না, আমাদের কম্পিউটার ক্লাসে একবার ঢুকলে বেরোতে দেওয়া হয় না।"

বোর্ডে একটা দান দিয়ে মিটিমিটি হাসছেন দীপকাকু। হাসিটা বাবার নাকি ঝিনুকের উদ্দেশে বোঝা যাচ্ছে না। মা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে। আলতো করে ঝিনুকের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দীপকাকু বলেন, "তোমাদের ইনস্টিটিউশনে আজ পাওয়ার অফ হয়নি। কোনও কারণে একটু আগে ছুটি হয়ে গেছে। তারপর তুমি আর শ্রবণা গড়িয়াহাটে গিয়েছিলে। প্রচুর ঘুরে ফুটপাথের দোকান থেকে অনামী কোম্পানির নেল পলিশ কিনেছ।"

রাগে গা-হাত-পা রি রি করছে ঝিনুকের। একই সঙ্গে বিস্ময়ের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। আশ্চর্য ক্ষমতা মানুষটার। দাবার বোর্ড দেখে বোঝা যাচ্ছে, খেলা অনেকক্ষণ শুরু হয়েছে। দীপকাকুর পক্ষে ঝিনুকদের দেখে ফেলার কোনও সুযোগই নেই। মায়ের সামনে নিজেকে ভীষণ অসহায় লাগছে। এইসব অস্বস্তিকর সময়ে বাবা একমাত্র ঝিনুকের সাপোর্টে হয়ে যান। বিচ্ছিরি একটা চাল দিয়ে বাবাকেও বোবা করে রেখেছেন দীপকাকু। কী যে করে ঝিনুক! পায়ে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল ভিতর ঘরে। তখন মাকে শুনিয়ে আর একটা টিপ্পনি কাটেন দীপকাকু, "বউদি, ওর ব্যাগটা সার্চ করুন। ভায়োলেট কালারের নেল পলিশ পাবেন।"

নিজের ঘরে ঢুকে হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল ঝিনুকের। কী কুক্ষণেই যে দীপকাকু আসেন এ-বাড়িতে। মা এখন হাজারো চিন্তা করতে শুরু করবেন। কাঁধের ব্যাগ বিছানায় ছুড়ে ফেলে অস্থির পায়চারি করে ঝিনুক, কীভাবে দীপকাকুকে শায়েস্তা করা যায়। মানুষটার কাজকম্মো নেই, ঘরে বসে পর্যবেক্ষণ ফলাচ্ছেন। এর আগেও একবার বিচ্ছিরি পরিস্থিতিতে ফেলেছিলেন। ইলেভেনের ফাইনাল। বাংলা পরীক্ষা দিয়ে এসে বাবাকে কোয়েশ্চেন দেখাচ্ছে ঝিনুক। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "সব অ্যানসার করেছিস তো?"

"হ্যাঁ বাবা।" সুবোধ মেয়ের মতো বলেছিল ঝিনুক। সেদিনও উলটোদিকের সোফায় বসে ছিলেন দীপকাকু। "দেখি, কোয়েশ্চেন পেপারটা," বলে চেয়ে নিলেন। প্রশ্নপত্রে চোখ বুলিয়ে বললেন, "চার নম্বর প্রশ্নটা, মানে 'সংজ্ঞা লেখো' হয় তুমি লেখনি, নয়তো শেষে দায়সারা লিখেছ।"

ঘাবড়ে গেলেও নিরাসক্ত মুখে ঝিনুক জিজ্ঞেস করেছিল, "কী করে বুঝলেন?"

"চার নম্বর কোয়েশ্চেনের মাথায় রাইট মার্কটা অন্য পেনে দেওয়া। সেই পেনে তুমি পরীক্ষা দাওনি।"

সেই যাত্রায় বাবা বাঁচান। বলেন, "আমার মেয়েটার ছোট থেকেই ভুলো মন। লিখেছে, পরে খেয়াল হতে মার্ক দিয়েছে।"

আজকের ব্যাপারটা যে কী করে আন্দাজ করলেন দীপকাকু, জানতে ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে ঝিনুকের। জিজ্ঞেস করলে বেশি পাত্তা দেওয়া হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং দীপকাকুর একপাটি চটি লুকিয়ে ফেলা যাক। খালিপায়ে বাড়ি ফিরুক। তা হলে বেশ হয়... এসব ভাবতে-ভাবতে আচমকাই ঝিনুকের মনে পড়ে, আরে, আজকেই না শ্রবণা বলছিল, ওর দিদা দুটো উড়ো চিঠি পেয়েছেন। মৃত্যুর হুমকি দেওয়া চিঠি। ওরা কিছুই বুঝতে পারছে না। পুলিশের কাছে যেতে ওর দিদার ভীষণ অনীহা। একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ খুঁজছেন।... তখন কেন মনে পড়েনি দীপকাকুর কথা, ভেবে আশ্চর্য হয় ঝিনুক। আসলে ডিটেকটিভ বলতে যে চেহারার কথা চোখে ভাসে, দীপকাকুর সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। মোটা গ্লাসের চশমা পরা দীপকাকুকে নেহাত একজন অঙ্কের টিচার মনে হয়।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ঝিনুক। প্রথমে কিচেনে গিয়ে মাকে শান্ত করতে হবে। খুব অভিমান হলে মা দু'চার ঘন্টা কাছেই আসবেন না। এদিকে ঝিনুকের আবার খিদেও পেয়েছে।

যা ভেবেছিল তাই। মা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে চাউ বানাচ্ছেন। ঝিনুক ভালবাসে। মায়ের কাঁধের কাছে গিয়ে ঝিনুক বলে, "সরি, মা। আর হবে না। শ্রবণা এমন জোর করল।"

কবজিতে চোখের জল মুছে মা বলেন, "তুই তো উঠতে-বসতে মিথ্যে কথা বলতে শুরু করেছিস। কী সাহস হয়েছে তোর। ভর সন্ধেবেলা দুটো বাচ্চা-বাচ্চা মেয়ে গড়িয়াহাটে ঘুরে-ঘুরে মার্কেটিং করছে! জানিস কত বাজে লোক ওখানে ঘুরে বেড়ায়।"

একটু অধৈর্য হয়ে ঝিনুক বলে, "মা, আমি বা শ্রবণা কেউই বাচ্চা নই। দু'জনেই হায়ার সেকেন্ডারি দিয়েছি। আর ভিতুদের চোখেই বাজে লোক বেশি পড়ে।"

"হ্যাঁ, তুমি একেবারে সাহসী মাতঙ্গিনী। আসলে সব দোষ তোর বাবার। উনিই আশকারা দিয়ে তোকে মাথায় তুলেছেন। আরে বাবা, মেয়েকে কি ছেলের মতো মানুষ করা যায়। প্রকৃতিগত কারণেই তারা ভিন্ন। জোর করে..."

এই শুরু হয়ে গেল। কতক্ষণ চলবে কে জানে। মানে-মানে কিচেন থেকে কেটে পড়ে ঝিনুক। তাকে নিয়ে বাবা, মায়ের এটা পুরনো এবং একমাত্র মতভেদ। এই হয়তো বাবা কারাটে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন, ক'দিন যেতেই ছাড়িয়ে নিয়ে এসে নাচের স্কুলে অ্যাডমিট করে দিলেন মা। বাবা শেখাচ্ছেন ক্যামেরায় ছবি তোলা, মা উলবোনা, রান্না করা। আর আশ্চর্য, সবকিছুই মোটামুটি পেরে যায় ঝিনুক। অবশ্য কোনওটাই ভাল করে শেখা হয় না। তবে বাবার ইচ্ছেতেই ঝিনুকের সায় বেশি।

বসার ঘরে এসে দাঁড়ায় ঝিনুক। বাবা, দীপকাকু দু'জনেই দাবায় মগ্ন। দীপকাকু হয়তো ভুলেই গেছেন কিছুক্ষণ আগে কী বিচ্ছিরি অবস্থায় ফেলেছিলেন ঝিনুককে। গলা ঝাঁকি দিয়ে বাবার সোফার হাতলে বসে ঝিনুক।

"কী হল, মা পেয়েছে নেল পলিশটা? " জানতে চান বাবা।

"না। মুড অফ, সার্চ করেনি।"

বোর্ডের দিকে তাকিয়ে বাবা বলেন, "তা হলে তো পোয়া বারো। এ সময় আমার কাছে শেল্টার নেওয়া কেন?"

"তোমার কাছে নয়। দীপকাকুর সঙ্গে একটু কথা আছে।"

"কী কথা?" এটা বললেন দীপকাকু। ঝিনুকের দিকে না তাকিয়েই।

ঝিনুক শুরু করে, "আমার বন্ধু শ্রবণাকে তো দেখেছেন। একটা সমস্যায় পড়েছেন ওর দিদা।"

"সমস্যাটা কী?" অনাগ্রহে জানতে চান দীপকাকু।

বাবা বলেন, "ও সব পরে হবে। আমাদের বোর্ডের সমস্যা আরও ঘোরতর।"

ঝিনুক দমে না। বলে, "শ্রবণার দিদা দুটো উড়ো চিঠি পেয়েছেন। লাইফ থ্রেটনিং লেটার।"

গজের চালটা দিতে গিয়েও থেমে যান দীপকাকু। বলেন, "আর একটু ডিটেলে বলো।"

খুব বেশি কিছু শ্রবণা বলেনি। ওর দিদা নাকি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের খোঁজ করছেন।

"পুলিশের কাছে যাননি?" ভ্রূ কুঁচকে জানতে চান দীপকাকু।

"বোধহয় না।"

বাবা তাড়া দেন, "কী হল দীপঙ্কর, তোমার দান দাও।"

"দাঁড়ান, ব্যাপারটা শুনতে দিন।" বলে ঝিনুকের দিকে ঘুরে যান কাকু।

বাবা বলেন, "সত্যি দীপঙ্কর, তোমার পসার দেখছি খুবই খারাপ। একটা ছোট্ট মেয়ের ইনফর্মেশনে তুমি রোজগারের গন্ধ পাচ্ছ!"

"রোজগার নয় রজতদা, কাজের স্যাটিসফ্যাকশন। যেদিন থেকে সিদ্ধান্ত নিলাম গোয়েন্দাগিরিটা প্রফেশন করে নেব, যার জন্য অফিস ঘর নিলাম, আজ পর্যন্ত একটাও জম্পেশ কেস এল না। খালি 'ছেলে কেন বখে যাচ্ছে, ফলো করো'। 'বিজনেস পার্টনার পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে কত জমা করছে বের করে দাও'। এইসব ফালতু কেস আসছে। রিয়েলি হোপলেস।" হতাশ শ্বাস ছাড়েন দীপকাকু। তারপর ঝিনুকের উদ্দেশে বলেন, "তোমার বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় না?"

"নিশ্চয়ই যায়।" বলে ঘরের কোণে ফোনস্ট্যান্ডের দিকে পা বাড়ায় ঝিনুক। মনে-মনে দীপকাকুকে বলে, "এইসব কেসে বোঝা যাবে আপনার বুদ্ধির দৌড়। নিজেকে একেবারে শার্লক হোম্‌স ভেবে বসে আছেন।"

ডায়াল করতে শ্রবণাই ধরল। ঝিনুক বলে, "তুই আজকে একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভের কথা বলছিলি না, তোর দিদার দরকার? আমার এক চেনা..."

কথার মাঝখানেই শ্রবণা বলে ওঠে, "আরে শোন না কী হয়েছে। বাড়ি ফিরে দেখি বাবা, মা দু'জনেই নেই। গঙ্গাদি বলল, 'কী একটা ফোন পেয়ে তক্ষুনি দিদার বাড়ি গেছে।' ফোন করলাম দিদাকে। বাবা ধরেছিলেন। তারপর যা বললেন সে এক আশ্চর্য কাণ্ড!"

"কী কাণ্ড?" গভীর কৌতূহলে জানতে চায় ঝিনুক।

ফোনের ওপার থেকে শ্রবণা বলতে থাকে, "বিকেলের দিকে দিদা মাঝে-মধ্যে বউবাজার লাইব্রেরিতে বই পালটাতে যান। আজও গিয়েছিলেন। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে দেখেন, লিভিং, ডাইনিং দুটো ঘরই লণ্ডভণ্ড। অথচ দিদা যেমনভাবে তালা দিয়ে গিয়েছিলেন ঘরে, তালা সেরকমই আছে।"

"তা হলে নিশ্চয়ই জানলা দিয়ে ঢুকেছিল। চুরি গেছে কিছু?"

"না রে, কিছুই চুরি যায়নি। আর জানলাও বন্ধ ছিল ভিতর থেকে।"

"স্ট্রেঞ্জ!" বলে ঝিনুক ফোন কানে রেখেই দীপকাকুর দিকে তাকাতে গিয়ে দেখে, কাকু ঘাড়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। চোখ কুঁচকে ঝিনুক রিসিভারে বলে, "কাজের লোকগুলো তখন কোথায় ছিল?"

"লক্ষ্মীপিসি আর বিনায়কদা বাড়িতেই ছিল। ড্রাইভার ছিল গাড়িতে, দিদার সঙ্গে।"

ঝিনুক বলে, "তা হলে ব্যাপারটা তো বেশ গোলমেলে মনে হচ্ছে। দীপকাকুকে নিয়ে কি এখনই যাব?"

"দীপকাকু কে?" অপর প্রান্ত থেকে জানতে চায় শ্রবণা।

"ও হো, বলা হয়নি, দীপকাকু আমাদের বাড়ির খুব ঘনিষ্ঠ। খুবই উঁচুমানের প্রাইভেট ডিটেকটিভ।" কথাটা বলেই আড়চোখে দীপকাকুকে একবার দেখে নেয় ঝিনুক। উঁচুমানের খোঁচাটা কি ধরতে পারলেন? মোটেই না। অন্যমনস্ক হয়ে কী যেন ভাবছেন।

ফোনের ওপারে শ্রবণা বলে, "দাঁড়া, ফোনে আর একবার বাবার সঙ্গে কনট্যাক্ট করি, দেখি কী বলেন।"

ফোন ছেড়ে দেয় শ্রবণা। রিসিভার নামিয়ে রাখে ঝিনুক। দীপকাকু

সাগ্রহে জানতে চান, "কী বলল, এখনই যেতে হবে?"

মাথা নাড়ে ঝিনুক। চাউমিনের প্লেট নিয়ে ঘরে ঢোকেন মা। বলেন, "কেউ কোথাও যাবে না। আগে খেয়ে নাও।"

সোফায় ফিরে আসে দীপকাকু, ঝিনুক। মা এখন অনেকটা স্বাভাবিক। দীপকাকুকে বলেন, "আচ্ছা দীপঙ্কর, এবার বলো তো কী করে বুঝলে ঝিনুক গড়িয়াহাটে গিয়েছিল? তার উপর আবার বেগুনি রঙের নেলপলিশ কিনেছে, খুব ঘুরেছে ..."

চাউমিনের প্লেট হাতে তুলে দীপকাকু বলেন, "ভেরি সিম্পল বউদি, ঝিনুক ঘরে ঢুকতেই আমি হালকা স্পিরিটের গন্ধ পাই। ওর জুতোয় প্রচুর ধুলো। গাড়িতে যাতায়াত করেছে, এত ধুলো লাগার কথা নয়।"

"কিন্তু নেলপালিশের রংটা পর্যন্ত কী করে বলে দিলে?" জানতে চান মা।

নিরাসক্তভাবে দীপকাকু বলেন, "ওর হাতের নখ, চেটো লক্ষ করলেই বুঝতে পারবেন।"

ঝিনুক নিজের বাঁ হাত চোখের সামনে মেলে ধরে বেশ বিব্রত বোধ করে, সত্যিই রংটা পছন্দ করার আগে বড্ড বেশিবার চেটোয় আর নখে ট্রাই করা হয়ে গেছে।

দীপকাকুর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দেখে মা তো থ। বাবা পর্যন্ত বলে ওঠেন, "মার্ভেলাস। দীপঙ্কর, তোমার হবে।"

অন্য সময় হলে প্রশংসাটা উপভোগ করতেন দীপকাকু। এখন মাথায় ঘুরছে শ্রবণার দিদার কেসটা। ঝিনুককে জিজ্ঞেস করেন, "শ্রবণার দিদার বাড়িটা কোথায়?"

"ক্রিক রো। বিশাল সাহেবি আমলের বাড়ি। দোতলা। মাসচারেক আগে একবার শ্রবণার সঙ্গে গেছি। ও বাড়িতে দিদার নিজের লোক বলতে কেউ নেই। তিনজন সবসময়ের কাজের লোক নিয়ে থাকেন।"

"নিজের লোক নেই কেন?" জানতে চান দীপকাকু।

"শ্রবণার কোনও মামা নেই। দাদুও মারা গেছেন। দিদার তিন মেয়ে। তিনজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে।"

"হুম।" বলে চুপ করে যান দীপকাকু। একটু ভেবে নিয়ে বলেন, "কী মনে হচ্ছে, কেসটা দেবে আমাকে?"

বাবা আক্ষেপের সুরে বলেন, "দীপঙ্কর, তোমার মতো জিনিয়াসকে এসব মানায় না। কেস যদি আসার হয়, এমনিই আসবে। এত আগ্রহ দেখানোর কিছু নেই।"

"রজতদা, আপনি যদি আমার লাইনে আসতেন, বুঝতেন কী কঠিন ঠাঁই। গল্প, উপন্যাসে প্রাইভেট ডিটেকটিভদের যেরকম উজ্জ্বল করে দেখানো হয়, বাস্তবে তা নয়। বিশেষ করে আমাদের কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা যথেষ্ট যোগ্য। প্রাইভেট ডিটেকটিভরা সেখানে ভিড়তেই পারে না। আপনি এই মুহূর্তে কলকাতার কোনও উল্লেখযোগ্য গোয়েন্দার নাম বলতে পারবেন?"

মাথা নাড়েন বাবা। বলেন, "বাস্তবে বাঙালিরা গোয়েন্দাগিরির চাইতে দাবাটা ভাল খেলে। নাও, চাল দাও।"

দায়সারাভাবে দীপকাকু যে চালটা দেন, ঝিনুক অবধি ভীষণ চমকে ওঠে, দুটো চালের পরেই মেট নির্ঘাত। কী হল মানুষটার, কেসটা হাতে আসতে না-আসতেই বেহাল হয়ে পড়েছেন।

## ॥ দুই ॥

কথা ছিল সকাল আটটায় আসার। সাড়ে সাতটায় হাজির দীপকাকু। ঝিনুক সবে বিছানা থেকে উঠে আড়মোড়া ভাঙছে। এফ এম রেডিওতে বাজছে রবীন্দ্রসঙ্গীত। দীপকাকুর সাড়া পেয়ে বিছানা থেকে লাফিয়ে নামে ঝিনুক। দ্রুত রেডি হতে থাকে।

কাল সন্ধেবেলা ঝিনুকের ফোনের পর শ্রবণা তার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে। ঠিক একঘণ্টা পর রিং ব্যাক করে শ্রবণা। বলে, "দিদাকে বলা হয়েছে তোর দীপকাকুর কথা। কালই দেখা করতে চান দিদা। পারবি নিয়ে আসতে?"

"কেন পারব না। কটায়, কোথায় যেতে হবে বল?"

"সকাল ন'টা-দশটা। দিদার বাড়িতেই। আমরা ওখানেই থাকব।"

"ঠিক আছে," বলে ফোন রেখে দিল ঝিনুক।

দীপকাকু জেনে নিলেন কী কথা হল। তারপর বললেন, "আবার শ্রবণাকে ফোন করো। বলো, ওর বাবা, মা যেমন যাচ্ছেন, যান। আমরা ওকে তুলে নেব।"

"কেন?" অবাক হয়ে জানতে চাইল ঝিনুক।

"ওর দিদার সম্বন্ধে কিছু তথ্য আগেভাগে নিতে হবে।"

"সে তো ওর বাবা, মা-ও দিতে পারতেন।"

"বড়দের তথ্যের চেয়ে তোমাদের বয়সীদের তথ্য অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। কেননা তা কখনওই বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয় না।"

কথাটা মাথায় ঠিকঠাক না ঢুকলেও, আগাম একটা উত্তেজনা বোধ করছিল ঝিনুক। তা হলে কি সত্যিই সে কোনও রহস্যজনক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হতে যাচ্ছে? তখনই বাধ সেধেছিলেন মা। বলে ওঠেন, "তোর কী দরকার এ সবের মধ্যে থাকার। তুই বলে রেখেছিস, দীপঙ্কর পৌঁছে যাবে। ব্যস, মিটে গেল।"

সে যাত্রায় দীপকাকুই বাঁচান। বলেন, "না বউদি, আমাকে ইনট্রোডিউস করার জন্য ঝিনুককে একবার অন্তত দরকার। যতদূর বোঝা যাচ্ছে, ভদ্রমহিলা এখনও পুলিশের কাছে যাননি। কোনও কারণে ঘটনাগুলো গোপনই রাখতে চান। বিশ্বস্ত মানুষ ছাড়া মুখ খুলবেন না। সে ক্ষেত্রে ঝিনুক সঙ্গে থাকলে মহিলা হয়তো আমার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত বোধ করবেন।"

দীপকাকুর কথায় বাবাও সায় দেন। তখনই ঠিক হয়ে যায় প্রোগ্রাম।

নিজের আলমারি খুলে দাঁড়িয়ে আছে ঝিনুক। ভাবছে কী পরা যায়। ডিটেকটিভ কাহিনিতে ঢুকতে যাচ্ছে, জিন্‌স, ক্যাজুয়াল টপই বোধহয় মানাবে। কিচেন থেকে মায়ের গলা ভেসে আসে, "দীপঙ্কর একটু বোসো, একেবারে ব্রেকফাস্ট করে বেরোবে।"

ড্রয়িং থেকে দীপকাকু বলেন, "না বউদি, দেরি হয়ে যাবে। শুধু চা। ঝিনুককে তাড়াতাড়ি রেডি হতে বলুন।"

ঝিনুক একদম টিপটপ হয়ে ড্রয়িংয়ে এসে দাঁড়ায়। প্লেটে ঢেলে তাড়াতাড়ি চা খাচ্ছেন দীপকাকু। কিন্তু এ কী ড্রেস! সদ্য চান করা, পেতে আঁচড়ানো চুল, না-গুঁজে পরা আদ্যিকালের সাদা শার্ট। কালো প্যান্ট। কাবলি জুতো। পকেটে পেন। চোখে ঢাউস চশমা। একেই বোধহয় বলে, সওদাগরি অফিসের কনিষ্ঠ কেরানি। ঝিনুক ভাবে, বেকার সে এত চিন্তাভাবনা করে ড্রেস করল।

জানলার কাছে আয়না রেখে মেজাজে দাড়ি কাটছেন বাবা। ঝিনুককে দেখে দীপকাকু বলেন, "চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।"

আয়না থেকে মুখ না সরিয়েই বাবা টিপ্পনী কাটেন, যাওয়ার পথে কালীঘাটে একটা পুজো দিয়ে যাস। আর হ্যাঁ, আমার গাড়িটা নিতে পারিস। মঞ্জেলকে ইমপ্রেস করা যাবে। অফিসের জন্য আমি না হয় ট্যাক্সি নিয়ে নেব।"

বাবার খোঁচা গায়ে মাখেন না দীপকাকু। ঝিনুকরা বেরিয়ে পড়ে।

ঝিনুকদের গাড়িটা ব্যবহার করতে কোনও দ্বিধা দেখাননি দীপকাকু। আশুদা গাড়ি চালাচ্ছে। মুখ একটু থমথমে। মনে হয় পছন্দ করছে না দীপকাকুকে। কাল গড়িয়াহাটে ঘোরার ব্যাপারটা চেপে যাওয়ার জন্য মায়ের কাছে বকুনি খেয়েছে। বেচারা আশুদা।

গাড়ির পিছনের সিটে শ্রবণা, দীপকাকু, ঝিনুক। ওয়ারলেস মাঠের সামনে থেকে শ্রবণাকে তোলা হয়েছে। ও রেডি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দীপকাকু একটার পর একটা প্রশ্ন করে শ্রবণার থেকে জেনে নিচ্ছেন ওর দিদার সবিস্তার। ওদের কথোপকথনে কান রেখে জানলার বাইরে তাকিয়ে আছে ঝিনুক।

দীপকাকুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রবণা এতক্ষণ যা-যা বলেছে, তা মোটামুটি এরকম, ওর দিদার নাম অপরাজিতা বসু। বয়স প্রায় ষাট। তখনকার দিনে বেশ উচ্চশিক্ষিতা। ইতিহাসে এম.এ। বছর পনেরো হল স্বামী মারা গেছেন। বাড়িটা ওঁর শ্বশুরমশাই কিনেছিলেন এক সাহেবের কাছে। এ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সাহেব সস্তায় বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে যায়। অপরাজিতার স্বামী ছিলেন একমাত্র সন্তান। অতএব বাড়িটার মালিক এখন অপরাজিতা দেবী। স্বামী ছিলেন সফল ব্যবসায়ী। ট্যাংরায় জুতো তৈরির কারখানা ছিল। কারখানাটা আপাতত লিজে দেওয়া আছে। সেখান থেকেই অপরাজিতা দেবীর যা কিছু আয়। একসময় অতি স্বচ্ছল অবস্থায় থাকার কারণে ওঁর খরচের হাতটা বেশ বেশি। না চাইতেই তিন মেয়ের জন্য যথেষ্ট ব্যয় করেন। শ্রবণার হয়েছে খুব সুবিধে, বায়না করলেই জিনিস পেয়ে যায়। রিসেন্টলি একটা মোবাইল ফোন সেট বাগিয়েছে দিদার থেকে। বিশাল বাড়িটা মেনটেন করতেও বেশ কিছুটা খরচ হয়। নীচের তলাটা তাই ভাড়া দিতেন। শেষ ভাড়াটে অপঘাতে মারা যাওয়ার পর আর ভাড়া দেননি।

"অপঘাত মানে? কীভাবে মারা গিয়েছিলেন?" শ্রবণার বর্ণনায় বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন দীপকাকু।

শ্রবণা বলেছে, "সুইসাইড। বিষ খেয়েছিলেন।"

তারপর শ্রবণা আরও কিছু বলে যাচ্ছিল, দিদার হাইপ্রেশার। কী-কী খেতে ভালবাসেন। গুনগুন করে এত সুন্দর গান করেন, অনেক বড়-বড় শিল্পীর তাক লেগে যাবে... বোঝা যাচ্ছিল, শ্রবণা তার দিদাকে খুবই ভালবাসে। দীপকাকু গুম মেরে বসে আছেন। গাড়ি লেনিন সরণি ক্রস করে ক্রিক রো-তে ঢুকে পড়ল।

বাইরে থেকে বাড়িটার প্রাচীনত্ব, বিশালতা কিছুই বোঝা যায় না। লোহার উঁচু গেটটুকু বাদ দিয়ে পাঁচিলের গায়ে পান, সিগারেটের দোকান। চা গুমটি। আর একটা প্লাস্টিক ছাউনির অস্থায়ী সংসার। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে হর্ন দিতেই কে যেন এসে খুলে দিল। নুড়ি বিছানো রাস্তা। ঝিনুকদের গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল পোর্টিকোর তলায়। শ্রবণার বাবা নেমে এসেছেন নীচে। ঝিনুকের সঙ্গে হাসি বিনিময় হল। দীপকাকুকে নমস্কার করে বললেন, "আমি হচ্ছি শ্রবণার বাবা। সমীর সেন।"

প্রতিনমস্কারে দীপকাকু বলেন, "আমি দীপঙ্কর বাগচী। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর।"

"হ্যাঁ, শ্রবণা আমাকে সব বলেছে। সেই অনুযায়ী ওর দিদাকেও বলেছি। আসুন, উনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

পুরনো আমলের কাঠের চওড়া সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে এল ঝিনুকরা। লম্বা ফালি বারান্দা। কোমর সমান লোহার নকশা কাটা গ্রিল। সমীর আঙ্কল যে ঘরটায় নিয়ে এলেন, সেটাকে কিছুতেই ড্রয়িংরুম বলে চালানো যাবে না। 'বৈঠকখানা' বলাই ভাল। বিশাল দরজা, জানলার মাথায় রঙিন কাচের আর্চ। মেঝেতে পুরনো চৌখুপি, বড়বড় সাদা-কালো টাইল্‌স। এ ঘরে আগেও একবার এসেছে ঝিনুক। সেদিনের মতো আজও পরিপাটি করে সাজানো আলমারি-ভর্তি বই। দেওয়ালে নানান সাইজের অয়েল পেন্টিং। কালো পালিশের প্রকাণ্ড সোফা, সেন্টার টেবিল, কর্নার-র‍্যাক, সবকিছুর মধ্যেই প্রাচীন ঐতিহ্যের ছোঁয়া। এমনকী ঘরের কোণে চোঙাঅলা গ্রামাফোন পর্যন্ত আছে। আগেরবার এত খুঁটিয়ে ঝিনুক এ সব লক্ষ করেনি। এটা কি দীপকাকুর সঙ্গে আসার ফল?

সোফায় বসে ঘরের চারপাশে চোখ বোলাচ্ছেন দীপকাকু। মুখে কিসের যেন অসন্তুষ্টি। সমীর আঙ্কল, শ্রবণা গেছে অপরাজিতা দেবীকে ডাকতে। বাড়িটা বড্ড নিঃঝুম। দূরে কোনও গলিতে ফেরিঅলা ডেকে যাচ্ছে। ক্রিক রো থেকে ভেসে আসছে গাড়ি এবং হাতে-টানা রিক্সা চলাচলের আওয়াজ। কলকাতাটা যেন পিছিয়ে গেছে পঞ্চাশ-ষাট বছর।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অপরাজিতা দেবী এলেন। ঝিনুক উঠে গিয়ে প্রণাম করল। বলল, "চিনতে পারছেন?"

ঝিনুকের থুতনি ধরে আদর করে অপরাজিতা দেবী বলেন, "কেন চিনব না। তুমি তো ঝিনুক। ভাল নাম আঁখি। শ্রবণার সঙ্গে একবারই এসেছিলে।"

শ্রবণার দিদার স্মৃতিশক্তি দেখে কৃতার্থ হয় ঝিনুক, ভাল নামটা অবধি মনে রেখেছেন। একই সঙ্গে খারাপ লাগে, চারমাস আগের সেই স্নিগ্ধ, লাবণ্যময়ী ভাবটা একটু যেন কম পড়ে গেছে ওঁর চেহারায়। দুশ্চিন্তার কারণেই হয়তো।

সমীর আঙ্কল আলাপ করিয়ে দিলেন দীপকাকু, অপরাজিতা দেবীর মধ্যে। অপরাজিতা দেবী সোফায় বসতে যাচ্ছেন, দীপকাকু বলেন, "চিঠিদুটো সঙ্গে আছে?"

মাথা হেলিয়ে অপরাজিতা দেবী আঁচলের আড়ালে রাখা দুটো ভাঁজ করা কাগজ এগিয়ে দিলেন। কাগজ দুটো নিয়ে দীপকাকু প্রথমে পকেট থেকে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস বের করলেন। ঝিনুক ভাবে, অত পুরু লেন্সের চশমাতেও হল না, আতশ কাচ লাগবে। খুব দ্রুত আতসকাচ সামনে রেখে চিঠিদুটো পড়ে নিলেন দীপকাকু। তারপর কাগজদুটো এক-এক করে আলোর দিকে ধরলেন। ফের আতস কাচ দিয়ে কী সব দেখলেন খুঁটিয়ে। চিঠিদুটো টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। ঘর নিস্তব্ধ। ঝিনুকের চিঠিদুটো দেখতে বড্ড কৌতূহল হচ্ছে।

ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকলেন শ্রবণার মা। মায়ের সঙ্গে দীপকাকুর আলাপ করাতে যাচ্ছিল শ্রবণা, কথা শুরুর মুখে দীপকাকু প্রচণ্ড বিরক্তির শব্দ করে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "আপনারা তো একটা গুরুত্বপূর্ণ ভুল করে বসে আছেন।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সবাই দীপকাকুর দিকে তাকায়। সমীর আঙ্কল বলেন, "কী ভুল?"

"কালকের লণ্ডভণ্ড ঘরটা আবার সাজাতে গেলেন কেন? আপনারা নিজের হাতেই নষ্ট করেছেন অনেক সূত্র।"

অপরাধী গলায় অপরাজিতা বলেন, "আসলে ঘর এলোমেলো থাকলে আমার ভীষণ অস্বস্তি হয়। তার উপর শোওয়ার ঘরটা না গোছালে ঘুমোতাম কী করে।"

"আশ্চর্য! আপনার ঘুমটাই বড় হল!" বলে সজোরে পায়চারি করতে থাকেন দীপকাকু। ঝিনুক বুঝতে পারে, এ ঘরে এসে থেকে কেন দীপকাকুর মুখে অসন্তোষ লেগে ছিল।

সাময়িক একটা বিরতি পেয়ে ঝিনুক টেবিল থেকে চিঠিদুটো তুলে নিল। চোখ বোলাতেই বুক হিম হয়ে যায় ঝিনুকের। কম্পিউটারে বাংলা হরফে লেখা চিঠি। একটায় লেখা, 'যে মূল্যবান জিনিসটি আপনার কাছে আছে, সেটা চাই। যদি রাজি থাকেন, কাল সকালে নীল শাড়ি পরে বারান্দায় দাঁড়ান। পরে যোগাযোগ করে নেব। রাজি না হলে আপনার মৃত্যু নিশ্চিত।'

দ্বিতীয় চিঠি, 'অযথা ঝুঁকি নিচ্ছেন। আরও দু'দিন সময় দেওয়া হল। মৃত্যুটা কিন্তু যন্ত্রণাদায়ক হবে।'

বোঝাই যাচ্ছে প্রথম চিঠির প্রস্তাবে রাজি হননি অপরাজিতা দেবী। তারপরই আসে দ্বিতীয় চিঠি। ঝিনুক অবাক হয়ে ভাবে, এরকম দুটো মারাত্মক চিঠি পড়ার পর, কী করে এত নির্বিকার থাকলেন দীপকাকু! তাঁর মাথায় এখন ঘুরছে, কেন ঘরটা গোছানো হল? ... পায়চারি থামিয়ে দীপকাকু অপরাজিতা দেবীকে জিজ্ঞেস করেন, "আমাকে একটা কথা স্পষ্ট করে বলুন তো, এত কিছুর পর কেন পুলিশকে খবর দেননি?"

"পুলিশ সম্বন্ধে আমার একধরনের বিরক্তি এসে গেছে।"

"কেন?"

দীপকাকুর প্রশ্নে অপরাজিতা দেবী বলেন, "আমার নীচের ঘরে ছিলেন সত্যব্রাণ মিত্র। দু'মাস হল মারা গেছেন। সুইসাইড। সে সময় পুলিশ এসে দিনের পর দিন আমাকে জেরা করেছে। এমন আতঙ্ক হয়ে গিয়েছিল, আমি ঘুমের মধ্যেও পুলিশি জেরা শুনতে পেতাম। আমার

pathagar.net

কাজের লোকেরাও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ভদ্রলোক পড়াশোনা নিয়েই থাকতেন। অত্যন্ত ভাল মানুষ। কেন যে হঠাৎ ...”

“হুম।” বলে সোফায় ফিরে এলেন দীপকাকু। আবার সরাসরি প্রশ্ন অপরাজিতা দেবীকে, “চিঠিদুটো তো কম আতঙ্কের নয়। আপনি ভয় পাননি?”

মৃদু হেসে অপরাজিতা বলেন, “এই বয়সে আর মৃত্যুভয় পাই না। মরতে তো একদিন হবেই। আমার জীবনে আর বাকিটা কী আছে!”

একটুও না দমে দীপকাকু বলেন, “কিন্তু যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু নিশ্চয়ই কাঙ্ক্ষিত নয়।”

অপরাজিতা দেবীর আচরণে সামান্য অপ্রস্তুত ভাব। বলেন, “সেটা ঠিক। আর তাই জন্যেই আপনাকে ডাকা।”

প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দীপকাকু বলেন, “মূল্যবান বস্তুটি কী? একবার দেখতে পারি?”

“সেটাই তো বুঝতে পারছি না।” অসহায়ভাবে বলেন অপরাজিতা দেবী।

ভ্রু কুঁচকে যায় দীপকাকুর। অবাক কণ্ঠে বলেন, “তার মানে আপনি জানেন না, আপনার কাছে কী চাওয়া হচ্ছে?”

“ঠিক তাই।” এটা বললেন সমীর আঙ্কল। তারপর বুঝিয়ে বলার ভঙ্গিতে শুরু করলেন, “দেখুন দীপঙ্করবাবু, এ বাড়ির অনেক কিছুই পুরনো আমলের। ফার্নিচার থেকে শুরু করে নানান শো পিস। দুষ্প্রাপ্য বই। কোনটা যে কত পুরনো এবং অতি মূল্যবান সেটা আমার মাদার ইন ল বুঝতে পারছেন না।”

“এটা বোঝার অবশ্য একটা সহজ উপায় আছে। কিউরিও-র এক্সপার্ট ডেকে নিয়ে এসে এ বাড়ির জিনিসগুলোকে একবার পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া যায়।” বলে চুপ করে ভাবতে লাগলেন দীপকাকু।

শ্রবণার মা এতক্ষণ শুধু শুনে যাচ্ছিলেন, এবার অপরাজিতার উদ্দেশে বলে উঠলেন, “মা, তোমার গয়নাগাটিগুলোর কথা বলো।”

“সে আর কী বলব, তিন মেয়ের বিয়ে দিতে অনেকটাই বেরিয়ে গেছে। আছে যে ক'টা, সবই পুরনো আমলের। রাজা-রানি, নবাব আমলের হলেও অবিশ্বাস করার উপায় নেই। আমার শ্বশুরমশাইয়ের পুরনো জিনিস কেনার ঝোঁক ছিল।”

অপরাজিতা দেবীর কথাগুলো মনস্ক ছাত্রের মতো শুনছেন দীপকাকু। ঝিনুক দীপকাকুকে এরকম ভঙ্গিতে আগে কখনও দেখেনি। এই ছটফট করছেন, পরক্ষণেই শান্ত। অপরাজিতা দেবী বলেন, “গয়নাগুলো কি আপনি একবার দেখবেন?”

“এখন না। আচ্ছা, আপনি ওগুলো ব্যাঙ্কের ভল্টে রাখেননি কেন?” জানতে চান দীপকাকু।

“সে অনেক ঝামেলার। তা ছাড়া বললাম তো, বেশি কিছু নেই। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিয়ে-থা লেগেই থাকে, আমার মেয়ে, নাতনিরা পরতে চায়।”

অপরাজিতা দেবীর কথা কেড়ে নিয়ে শ্রবণার মা বলেন, “একটা সোনার কোমরবন্ধ আছে, আর নবাব আমলের মুক্তোর মালা।”

“আপনি কী করে জানলেন ওটা নবাব আমলের?” দীপকাকুর প্রশ্ন।

শ্রবণার মা বলেন, “বাবা আমাদের গল্প করেছেন।”

দীপকাকু হঠাৎ উঠে দাঁড়ান। বলেন, “আমি একবার শোওয়ার ঘরটা দেখব।”

সমীরবাবু বলেন, “অবশ্যই, আসুন।”

ঝিনুকরা সবাই মিলে অপরাজিতা দেবীর শোওয়ার ঘরে আসে। বৈঠকখানার মতো এই ঘরটাও সুন্দর করে সাজানো। কারুকাজ করা পালঙ্ক। বড়-বড় দুটো আলমারি। একটা কাঠের, অন্যটা স্টিলের। ওয়ার্ডরোব, উঁচু বুককেস। ঘরে একমাত্র বেমানান আধুনিক জিনিসটি হচ্ছে রেফ্রিজারেটর। খড়খড়ি দেওয়া জানলা তিনটে হাট করে খোলা। বাইরে ঝকঝকে রোদ্দুর।

ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে দীপকাকু চলে গেলেন জানলার কাছে। ঝিনুকও গেল। জানলার নীচে বাগান। দীপকাকু জানলার গরাদগুলো টেনে-টেনে দেখছেন, পরীক্ষা করছেন ছিটকিনিগুলো। কাজ করতে-করতেই অপরাজিতাকে জিজ্ঞেস করেন, “আপনি যখন লাইব্রেরি থেকে বেরিয়েছিলেন, নিজের হাতেই বন্ধ করেছিলেন দরজা জানলা, নাকি কোনও কাজের লোক হেল্প করেছিল? ভাল করে মনে করুন।”

একটু ভেবে নিয়ে অপরাজিতা বলেন, “আমিই করেছিলাম। পুরো মনে করতে পারছি।”

“ফাইন,” বলে দীপকাকু এবার যেটা শুরু করলেন, তা দেখে ঝিনুক একেবারে থ! পকেট থেকে মেজারমেন্ট টেপ বের করে পরাদের দূরত্ব মাপছেন। আবার বেরোল আতস কাচ, গভীর মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন, গরাদ, কাঠের ফ্রেম। কাজ শেষ করে ঘুরে দাঁড়ালেন। অপরাজিতা দেবীকে বললেন, “গয়নাগাটি নিশ্চয়ই ওই স্টিল আলমারিতে ছিল?”

ঘাড় হেলান অপরাজিতা দেবী। দীপকাকু এগিয়ে যান আলমারির সামনে। এবার পকেট থেকে বের হল পেন্সিল টর্চ। আলো জ্বালিয়ে চাবির ফুটো পরীক্ষা করতে লাগলেন। চোখের সামনে ধরলেন আতস কাচ। অপরাজিতার উদ্দেশে বলে উঠলেন, “ঘটনার পর গয়নাগুলো আছে কিনা, দেখে নিয়েছিলেন?”

“দেখেছিলাম। আছে।” বললেন অপরাজিতা দেবী।

সবাইকে থতমত খাইয়ে দীপকাকু এবার জ্বলন্ত টর্চ নিয়ে ঘরে হামাগুড়ি দিতে শুরু করেছেন! ঝিনুকের ভারী অস্বস্তি হচ্ছে। বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে ব্যাপারটা। এঁরা কী ভাবছেন কে জানে!”

খাটের তলায় আলমারির নীচে আলোকিত টর্চ বুলিয়ে উঠে দাঁড়ালেন দীপকাকু। এতক্ষণের কর্মকাণ্ডে অদ্ভুত চেহারা হয়েছে, চুল উসকো-খুসকো। নাকের ডগায় চশমা। সামান্য জোরে শ্বাস নিচ্ছেন। একটু ধাতস্থ হয়ে বলেন, “আপনাদের আর একটু কষ্ট দেব।”

“না না বলুন, কষ্টের কী আছে!” সবিনয়ে বলেন সমীর আঙ্কল।

“এই ঘরটাকে গতকাল সন্ধের মতো এলোমেলো করতে হবে। জানি, ব্যাপারটা হয়তো ততটা নিখুঁত হবে না। তবু যতটা পারা যায়।”

সত্যিই এ বাড়ির সবাই খুব ভদ্র, কেউ আপত্তি তুললেন না। অপরাজিতা দেবীর উদ্দেশে দীপকাকু বলেন, “আপনাকে কিছু করতে হবে না। আপনি শুধু বর্ণনা করে যান। আমি, সমীরবাবু জিনিসগুলো কালকের মতো করে নিচ্ছি।”

মাথা হেলিয়ে অপরাজিতা দেবী বর্ণনা দিতে শুরু করলেন, “আলনার সব শাড়ি, কাপড় মাটিতে ফেলা ছিল। ড্রেসিং টেবিলের সব দেরাজ খোলা। রাইটিং টেবিলের ফাইলগুলো বিছানায় ওলটপালট করে রাখা। বুক শেল্‌ফের বেশ কিছু বই মেঝেতে পড়েছিল ...”

ঝিনুকের কনুই ধরে কে যেন টান মারে। ঘুরে তাকাতে দেখে শ্রবণা, চোখের ইশারায় বাইরে যেতে বলছে।

ঘরের বাইরে এসে শ্রবণা হতাশ ভঙ্গিতে বলে ওঠে, “হ্যাঁ রে, সত্যি করে বল তো লোকটা পাগল না জিনিয়াস?”

আমতা-আমতা করে ঝিনুক বলে, “দুটোর মাঝামাঝি। খুবই উঁচু মানের গোয়েন্দা, দারুণ দাবা খেলেন।”

শেষ কথাটা বলে ফেলে বিব্রত বোধ করে ঝিনুক, সার্থক গোয়েন্দার ভাল দাবা খেলাটা কতটা আবশ্যক, জানে না সে। শ্রবণার চিন্তিত মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, কথাটা ধরেনি। শ্রবণা বলে ওঠে, “ওঁর সল্‌ভ করা মেজর কোনও কেসের কথা তোর জানা আছে?”

“নিশ্চয়ই। বেহালার ব্যবসায়ী পুত্র অপহরণ। বারাসাতে জাল নোটের চক্র, সোনারপুরের মন্দিরে অষ্টধাতুর মূর্তি চুরি ...” মিথ্যেগুলো বলতে একটুও গলা কাঁপছে না ঝিনুকের। আসলে ঘটনাগুলো নিউজ পেপারের মাধ্যমে এত চেনা-চেনা ঠেকে, চট করে কেউ অবিশ্বাস করতে পারবে না। যদিও শ্রবণার মুখ থেকে এখনও

সন্দেহের মেঘ কাটেনি।

বাঁচিয়ে দিল এ বাড়ির কাজের মহিলা এসে। মাঝবয়সী, আচরণে জড়সড় ভাব। সম্ভবত লক্ষ্মীমাসি, পিছনেই দু'ধাপ সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে আছে যে লোকটা, হয় ড্রাইভার, নয়তো বিনায়কদা। গতবার যখন এসেছিল ঝিনুক, ভাল করে লক্ষ করেনি এদের। লক্ষ্মীমাসি ভয় পাওয়া গলায় শ্রবণাকে বলে, "পুলিশ এসেছে নাকি গো দিদি? উপরতলায় কীরকম হুড়ুম দুড়ুম আওয়াজ হচ্ছে।"

"না, পুলিশ নয়। তোমরা তোমাদের কাজে যাও।" গম্ভীরভাবে বলে শ্রবণা। লক্ষ্মীমাসি মোটেই জায়গা ছাড়ে না। এখানে দাঁড়িয়েই উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে ঘরের দিকে। শ্রবণা, ঝিনুক ঘরে ঢুকে যায়।

পরিপাটি ঘরটার কী বিচ্ছিরি অবস্থা হয়েছে এখন। চারদিকে জিনিসপত্তর ছড়ানো-ছেটানো। গালে হাত দিয়ে একদৃষ্টিতে সে সবের দিকে তাকিয়ে আছেন দীপকাকু। এত কিছুর পরেও বিরক্ত না হয়ে অপরাজিতা দেবী বলেন, "ও, বলা হয়নি। ফ্রিজে যা মিষ্টি ছিল, সব খেয়েছে। ফ্রিজ থেকে জল খেয়ে বোতলটা এখানে রাখা ছিল ..."

বোতলটা নিচু টেবিলের উপর রেখে কাজ শেষ করলেন অপরাজিতা দেবী। দীপকাকু একই ভঙ্গিতে। হঠাৎ স্ট্যাচু ভেঙে বলে উঠলেন, "ঠিক আছে, জিনিসগুলো গুছিয়ে নিন। আমি একবার বাড়ির পিছনের বাগানটা দেখব।"

শ্রবণার বাবা সঙ্গে-সঙ্গে রাজি। ঝিনুক একটু দোটানায় পড়ে যায়। সে ছাড়া ঘরের তিন মহিলা জিনিসগুলো গোছাচ্ছে, সাহায্য করা উচিত। ওদিকে দীপকাকু কী করেন সেটা দেখার জন্যেও ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে। শেষমেশ দীপকাকুদেরই ফলো করে ঝিনুক।

বাড়ির পিছনের বাগানটা ভীষণ নিরালা। বড়-বড় গাছ। দু'চারটে পাখিও ডাকছে। দারুণ পরিবেশ। বাগান-শেষে উঁচু পাঁচিল। বোঝাই যাচ্ছে এদিকে কেউ খুব একটা আসে না। — বাগানটা দেখতে গিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল ঝিনুক। হঠাৎ দেখে বাড়ির দেওয়াল থেকে ফিটতিনেক ছেড়ে হেঁটে যাচ্ছেন দীপকাকু। দৃষ্টি মাটির দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে পাশে গিয়ে হাঁটতে থাকে ঝিনুক। পিছনে সমীর আঙ্কলও আসছেন। অপরাজিতা দেবীর ঘরের নীচে এসেও দীপকাকুকে দাঁড়াতে না দেখে ঝিনুক বলে, "জানলা দিয়ে ঢোকেনি তো?"

দীপকাকু বলেন, "সে চান্স নেই। কোনও পাইপ নেই দেওয়ালে। কার্নিশ থেকে কার্নিশের দূরত্বও অনেক।"

"রক ক্লাইম্বিং-এর কায়দায় দড়ি ছুড়ে ওঠা যেতে পারে।" বলে ঝিনুক।

উত্তরে দীপকাকু বলেন, "তা পারে। কিন্তু গরাদের ওইটুকু ফাঁক দিয়ে গলবে কীভাবে?"

ঝিনুক বুদ্ধি করে বলে, "বাচ্চা ছেলেকে দিয়ে যদি কাজটা করায়?"

দীপকাকুর মুখে মিটিমিটে হাসি। বলেন, "বুদ্ধিটা বড্ড উপর-উপর খাটছে। তলিয়ে ভাবো। বাইরে থেকে ছিটকিনি খোলা যতটা সহজ, বেরিয়ে এসে বন্ধ করা তার চেয়ে অনেক শক্ত। তা ছাড়া দু'টো ঘরের ভিতরে যে তাণ্ডবটা চলেছে, সেটা কোনও বাচ্চা ছেলের কম্মো নয়। উঁচু-উঁচু তাক থেকে জিনিস ছুড়ে ফেলা হয়েছে। আর আমি জানলা, গরাদগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি, ছিটকিনি লুজ নেই, কোনও দড়ি বা আংটার দাগ নেই জানলার ফ্রেমে।"

পুরোপুরি দমে যায় ঝিনুক। মাটির দিকে তাকিয়ে হেঁটেই যাচ্ছেন দীপকাকু। অপরাজিতা দেবীর ঘরের পর দোতলা শেষ। তারপর একতলার শেষ ঘর। ছোট-ছোট দুটো জানলা। সমীর আঙ্কলের উদ্দেশে দীপকাকু বলেন, "এটা নিশ্চয়ই এ বাড়ির ভাঁড়ারঘর?"

"হ্যাঁ। এখন আর ব্যবহার হয় না। তালা দেওয়াই থাকে।" বলেন সমীর আঙ্কল।

"কাজের লোকেরা কোথায় থাকে?"

"নীচের তলায়। রান্নাঘরের পাশে একটা ঘর আছে।"

"আর ভাড়াটে কোন ঘরে ছিলেন?"

"সামনের দিকে। একদম সেপারেট অ্যাকোমোডেশন। শ্বশুরমশাইয়ের আমলে ওটাই ছিল গেস্টরুম। ব্যবসা সূত্রে যে সব ভিনরাজ্যের ব্যবসায়ী শ্বশুরমশাইয়ের কাছে আসতেন, ওখানেই থাকার বন্দোবস্ত হত।"

সমীর আঙ্কলের কথা শেষ হতেই মোবাইল ফোন বেজে ওঠে। ঝিনুক জানে, আওয়াজটা দীপকাকুর সেটের। ঝিনুকদের বাড়ি থাকাকালীন ফোনটা কদাচিৎ বেজেছে, বিদঘুটে শব্দ, তাই ভোলা যায় না।

প্যান্টের পকেট থেকে ফোনসেট বের করে নম্বর দেখেন দীপকাকু। ঝিনুকের দিকে ফোনটা বাড়িয়ে বলেন, "রজতদার ফোন। ছোট করে কথা সারো। বলে দাও, আপাতত ফোন না করতে।"

সুইচ টিপে কানে ফোন নেয় ঝিনুক, "হ্যাঁ, বাবা বলো।"

অপর প্রান্তে বাবা বলেন, "তোদের তদন্তের কতদূর? পুরনো বাড়ির অ্যান্টিক দাবার বোর্ড বের করে খেলতে বসে গেছে নাকি দীপঙ্কর?"

ঝিনুক হাসে। বলে, "বাড়ি গিয়ে সব বলব। তুমি এখন আর ফোন কোরো না।"

"ওকে, আমি তা হলে একটা জমজমাট রহস্য কাহিনি শোনার অপেক্ষায় থাকছি। উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক।"

ফোন ছেড়ে দেন বাবা। ঝিনুক সেটটা ফেরত দিতে যাবে, দেখে, দীপকাকু মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছেন। হঠাৎ চাপা উত্তেজনায় বলে ওঠেন, "এই তো!"

সমীর আঙ্কল বলেন, "কী?"

ঝিনুকও ঝুঁকে দাঁড়ায়। দীপকাকুর সামনে মাটিতে ছোট-ছোট দুটো আয়তাকার গর্ত। ঝিনুক জিজ্ঞেস করে, "কিসের গর্ত?"

"এখানেই মই লাগিয়েছিল।" বলে, আবার ফিতে বের করে গর্তদুটোর দূরত্ব এবং গর্তগুলো মাপতে শুরু করেন দীপকাকু।

সমীর আঙ্কল বলেন, "মই লাগালে তো গর্তগুলো গোল হত। এ তো দেখছি রেকট্যাঙ্গুলার।"

"মই সবসময় বাঁশেরই হবে, ধরে নিচ্ছেন কেন? ব্যবহার করেছে স্টিলের ফোল্ডিং ল্যাডার।" বলে, সোজা হয়ে দাঁড়ান দীপকাকু। একতলার ছাদের দিকে তাকিয়ে পিছু হটতে থাকেন।

সমীর আঙ্কল বলেন, "একতলার ছাদে না হয় উঠল। কিন্তু সেখান থেকে তো দোতলার বারান্দাটা বেশ উঁচুতে। পার হল কী করে?"

"কোনও ব্যাপারই না। মইটা তুলে আবার ওখানে লাগিয়েছে।"

দীপকাকুর সমাধানে ভীষণ লজ্জা পেয়ে যান সমীর আঙ্কল। বলেন, "সত্যিই তো, ওই স্টিলের মইগুলো বেশ হালকা হয়।"

থুতনি আর ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে চোখ কুঁচকে আছেন দীপকাকু। একটু পরে বলে ওঠেন, "এত দূর তো হল, ঘরের চাবি খুলল কী করে?"

সমীর আঙ্কল, ঝিনুক দু'জনেই চুপ করে আছে। বাগানের পাখিগুলো ডাকছে নিজের মনে। স্বগতোক্তির ঢঙে দীপকাকু বলেন, "তার মানে ডুপ্লিকেট চাবি ব্যবহার করা হয়েছে।"

"এমনও তো হতে পারে লোকটা তালা খোলায় এক্সপার্ট।" বললেন সমীর আঙ্কল।

মাথা নেড়ে দীপকাকু বলেন, "সে সম্ভাবনা নেই। তালা একবার অন্যভাবে খোলা হলে আর আগের মতো লাগানো যায় না।"

সমীর আঙ্কল এবার লজ্জা পাওয়ার বদলে সপ্রশংস দৃষ্টিবিনিময় করেন ঝিনুকের সঙ্গে।

দীপকাকু জিজ্ঞেস করেন, "আচ্ছা সমীরবাবু, আপনার শাশুড়ি কি কোনও বিশ্বাসভাজনের কাছে ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি রাখেন? এই ধরুন, আপনার মতো ঘনিষ্ঠ কেউ?"

রীতিমত আঁতকে উঠে একহাত পিছিয়ে যান সমীর আঙ্কল। বিস্ময়ের কণ্ঠে বলেন, "আপনি কি আমাকে সন্দেহ করছেন?"

"সন্দেহ করাটা যদিও আমার প্রফেশনের অঙ্গ, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি আপনাকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করেছি মাত্র। বলেছি, আপনার মতো বিশ্বাসভাজন আর কেউ ..."

দীপকাকুর প্রবোধ বাক্যে কাজ হল না। একটু যেন মিইয়ে গেছেন সমীর আঙ্কল। অভিমানী কণ্ঠে বলেন, "আমার মাদার ইন ল খুবই আত্মসচেতন এবং স্বনির্ভর। নিজের সামান্য কোনও কাজ কারও উপর চাপিয়ে দেন না।"

"খুব ভাল কথা। এবার চলুন বাড়ির কাজের লোকদের ইন্টারভিউ নেওয়া যাক।" বলে, ভিতরবাড়ির দিকে পা বাড়ালেন দীপকাকু। একটা ব্যাপার দেখে অবাক হচ্ছে ঝিনুক, এরকম একটা জটিল সমস্যার মধ্যেও ছোটখাটো রসিকতা করে যাচ্ছেন দীপকাকু। এইমাত্র সমীর আঙ্কলকে বিব্রত করলেন, কাজের লোকদের জেরা করার বদলে বলছেন ইন্টারভিউ। দীপকাকুর এই গুণটার কথা অজানা ছিল ঝিনুকের।

দোতলায় উঠে দীপকাকু প্রথমেই চলে গেলেন বারান্দার শেষ প্রান্তে, যার নীচেই ভাঁড়ারঘরের ছাদ। বিপজ্জনকভাবে শরীর ঝুলিয়ে রেলিং-এর উলটো পিঠে কী যেন পরীক্ষা করতে লাগলেন। সেখানেও ব্যবহার হল আতস কাচ। অনুসন্ধানের এই পর্যায়টা অবশ্য সহজেই বুঝে গেল ঝিনুক। স্টিলের মইটা ওখানে ঠেস দেওয়া হয়েছিল কিনা দেখছেন দীপকাকু। ঝিনুক কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, "পেলেন দাগ?"

ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হেসে দীপকাকু বলেন, "পেলাম।"

এবার ফালি-বারান্দার মাঝামাঝি চলে গেছেন দীপকাকু। প্যান্টের পকেট থেকে খেলনা-গোছের বাইনোকুলার বের করে চোখে লাগালেন। কত কিছু আছে পকেটে! যেন মিউজিয়াম নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বাড়ির সামনেটায় দূরবিন-দৃষ্টি বোলাচ্ছেন এপাশ থেকে ওপাশ। ঠিক কী যে দেখছেন, বোঝা যাচ্ছে না। এ বাড়ির উত্তর, দক্ষিণে দু'টো চারতলা বাড়ি। মাঝে কারখানার লম্বা শেড। এরই ফাঁকে দু'চারটে গাছপালাও চোখে পড়ছে। দীপকাকুর পাশে দাঁড়িয়ে ঝিনুক বলে, "আমি একটু দেখি?"

বাইনোকুলারটা দেন দীপকাকু। চোখে লাগিয়েই পিছিয়ে আসে ঝিনুক। মনে হয় এই বুঝি ঘাড়ের উপর বাড়ি, গাছপালা এসে পড়ল। তার মানে মোটেই বাচ্চাদের নয় দূরবিনটা। উত্তরের বাড়ির চারতলার জানলায় দৃষ্টি আটকে যায় ঝিনুকের। একজন উসকো-খুসকো চেহারার বৃদ্ধ ঝিনুকদের দিকে তাকিয়ে আছে।

দীপকাকু, ঝিনুক এখন বৈঠকখানায়। এটাই এখন জেরা করার ঘর। বাড়ির মালিকপক্ষের কাউকে অ্যালাউ করা হয়নি এ ঘরে। একটা লেটারপ্যাড চেয়ে নিয়েছেন দীপকাকু। নিজের পেন আর প্যাডটা দিয়ে ঝিনুককে বলেছেন, 'আমার ক্রস এগজামিনেশনগুলো সামারি করে লিখে রাখো।' তারপর এক-এক করে ডাকা হল লক্ষ্মীমাসি, বিনায়কদা, ড্রাইভার রঘুকে। ড্রাইভারকে এই প্রথম দেখল ঝিনুক। আগের দু'জনকে আগেই দেখেছে, সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসেছিল ওরা। দীপকাকুর জেরা থেকে ঝিনুক যা-যা লিখেছে, মোটামুটি এরকম, লক্ষ্মীমাসি, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। বছর পনেরো এ বাড়িতে

আছে। লক্ষ্মীমাসি শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত। তিনকুলে কেউ নেই। অপরাজিতা দেবী ওর মা, বাবা, মালকিন সব কিছু। এরপর এল বিনায়কদা, বয়স ষাটের উপর। বেলেঘাটায় নিজেদের বাড়ি থাকলেও যায় না। শরিকি ঝামেলা। এখানে শান্তিতে আছে। কুড়ি বছর বয়স থেকে এ বাড়ির মালিকের কারখানায় বেয়ারার কাজ করত। বাবু ভালবাসতেন খুব। উনি গত হওয়ার পর মা বাড়িতে ডেকে নেন। বিনায়কদার বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি।

লক্ষ্মীমাসি আর বিনায়কদাকে জরুরি একটা প্রশ্ন করেন দীপকাকু, "উপরে অতবড় কাণ্ড হল, তোমরা টের পেলে না!"

প্রশ্নটা ঝিনুকের মাথাতেই আগে আসা উচিত ছিল। সে দেখেছে, অপরাজিতা দেবীর ঘরটা আবার যখন ওলটপালট করছিলেন দীপকাকু, আওয়াজ শুনে এরা দু'জনেই উঠে এসেছিল উপরে। দীপকাকুর প্রশ্নের উত্তরে লক্ষ্মীমাসি, বিনায়কদা বলেছে তখন দু'জনেই নাকি রান্নাঘরে ছিল। পাঁচিলের ওপারে দেশোয়ালিরা কীর্তন করছিল মাইক বাজিয়ে।

পরবর্তী কাজের লোক রঘু। বয়স তিরিশের নীচে। রঘুর বাবাও এ বাড়িতে গাড়ি চালাত। বয়স হয়ে যেতে ছেলেকে এখানে দিয়ে ফিরে গেছে দেশের বাড়ি। বছরছয়েক রঘু এ বাড়ির গাড়ি চালাচ্ছে। কথার ফাঁকে মাইকের ব্যাপারটা যাচাই করে নেন দীপকাকু। রঘুও বলে, কাল সারাদিন মাইক চলেছিল। শিবরাত্রির আগে এরকম নাকি প্রায়ই হয়।

রঘু বেরিয়ে যেতে ঘরে ঢুকলেন শ্রবণার মা। বললেন, "কিছু খেয়ে নিন আপনারা। এসে থেকেই তো কাজ করে যাচ্ছেন।"

"এখন না। আর ক'টা কাজ বাকি আছে। প্লিজ একবার সমীরবাবুকে ডেকে দিন।"

দীপকাকুর কথা শেষ হতেই ঘরে ঢুকলেন সমীর আঙ্কল। দীপকাকু বলেন, "দুটো ঘর তো দেখা হয়ে গেছে, বাকি ঘরগুলো একবার দেখতে হবে। কাজের লোকদের জিনিসপত্তরগুলো সার্চ করতে হবে।"

"অবশ্যই। চলুন।" বলে ডেকে নেন সমীর আঙ্কল। দীপকাকুদের অনুসরণ করে সিঁড়ির দিকে যেতেই ঝিনুকের সঙ্গে চোখাচোখি হয় শ্রবণার। বারান্দার এক কোণে অপরিচিতের দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আসলে ঝিনুককে তো এই রূপে কোনওদিন দেখেনি।

নীচের সব ঘরই দেখা হল খুঁটিয়ে। সার্চ করা হল কাজের লোকের জিনিস। তালা দেওয়া ভাঁড়ারঘর খোলা হল। কোথাও অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েনি ঝিনুকের। দীপকাকুও হোঁচট খাননি অনুসন্ধান পর্বে। ঝিনুকরা আটকে গেল বাইরের দিকে একটা ঘরের সামনে। এই ঘরটাও তালা দেওয়া। সমীর আঙ্কলের উদ্দেশে দীপকাকু বলেন, "এটা নিশ্চয়ই গেস্টরুম। যে ঘরে শেষ ভাড়াটে ছিলেন।"

মাথা হেলিয়ে সায় দেন সমীর আঙ্কল। দীপকাকু বলেন, "খোলা যাবে একবার?"

"দাঁড়ান, চাবিটা সঙ্গে নেই। উপর থেকে আনতে হবে।" বলে দু'পা এগিয়ে ফিরে এলেন সমীর আঙ্কল। বললেন, "খুব কি দরকার? ঘরটা তো দু'মাস ধরে তালা দেওয়াই আছে। কেউ ঢোকে-বেরোয় না।"

"সব ঘরই যখন দেখলাম, এটা আর বাকি থাকে কেন।" বলেন দীপকাকু। অগত্যা সমীর আঙ্কলকে যেতেই হয় দোতলায় চাবি আনতে। সত্যিই ভীষণ নাকাল হতে হচ্ছে ওঁকে। এদিকে দীপকাকুর কোনও ক্লান্তি নেই। এই সময়টুকু কাজে লাগাতে বন্ধ দরজাটা ঠেলে, তালাটা টেনে ভাল করে দেখলেন। ঘরটাকে আধপাক মেরে পরীক্ষা করলেন বন্ধ জানালাগুলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই চাবি হাতে ফিরে এলেন সমীর আঙ্কল।

দরজা খোলা হল। আবছা অন্ধকার ঘরটাতে ভ্যাপসা গন্ধ। সমীর আঙ্কল সুইচ টিপে আলো জ্বালাতে দেখা গেল ঘরটি ধুলোমলিন একটি ড্রয়িংরুম। একটু এলোমেলো হলেও টিভি, ভিসিডি, র‍্যাক-ভর্তি বই — সবই আছে। কয়েক জায়গায় মাকড়সার জালও দেখা গেল।

ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে দীপকাকু বললেন, "এ সব তো আপনাদের নয়, শেষ ভাড়াটের। কী যেন নাম?"

"সত্যবান মিত্র। আপনি কী করে বুঝলেন এগুলো আমাদের নয়?" বিস্ময়ের কণ্ঠে জানতে চাইলেন সমীর আঙ্কল। ঝিনুকও বুঝতে পারে ঘরটা এদের নয়। কেন নয়, যুক্তিগুলো সাজাতে পারে না। ঘরটা ঘুরে দেখতে দেখতে দীপকাকু সেগুলোই বলতে থাকেন, "প্রথমত এ ঘরের ইন্টিরিয়র ডেকরেশনের সঙ্গে আপনাদের বাকি ঘরগুলোর মিল নেই। সিগারেটের প্যাকেট, উপচে পড়া অ্যাশট্রে। দেখে বোঝা যায় অন্য কেউ এ ঘরে বাস করত। আপনাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ভদ্রলোক সারাক্ষণ পড়াশোনা নিয়েই থাকতেন। বুক শেল্‌ফের অত বই তা প্রমাণও করছে।"

"সত্যিই তো, জলের মতো সোজা।" সমীর আঙ্কলের গলায় সরল উচ্ছ্বাস।

দীপকাকু বলেন, "কিন্তু ব্যাপারটা যে এত সহজ ঠেকছে না।"

"কীরকম!" জানতে চান সমীর আঙ্কল।

"ভদ্রলোক মারা গেছেন, তবু তাঁর জিনিসপত্তর এখানে রয়ে গেল কেন? ওঁর কি কোনও ওয়ারিশন নেই?"

"আছে। দুই ছেলে। ছোট ছেলে দিল্লিতে, বড়জন এখানেই, বালিগঞ্জে। বাবার সঙ্গে দু'ছেলেরই পটত না।"

"সে তো জীবিতকালে। এখন তাদের জিনিসগুলো দিয়ে, ঘরগুলো হোয়াইট ওয়াশ করে রাখাই স্বাভাবিক হত। আপনাদের জায়গায় যে কেউ হলে এটা করতেন।"

"মানছি। আমরাও সেটাই চেয়েছিলাম। বাবা মারা যাওয়ার পর ছোট ছেলে আসেইনি, বড় ছেলে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম করেছে, তারপর আর এ বাড়িতে পা রাখেনি। দুই ছেলেকেই বারবার ফোন করে বলা হয়েছে জিনিসগুলো নিয়ে যেতে। ছোট ছেলে বলেছে, 'যা করার দাদা করবে, আমি কোনও ব্যাপারে নেই।' বড় ছেলে বলেছে, 'ফেলে দিন। বিলিয়ে দিন। বাবার কোনও জিনিসের উপর আমার আগ্রহ নেই।' কোনও কারণে বাবার উপর হয়তো রাগ, যা মারা যাওয়ার পরও কমেনি।"

"আর আপনারা প্রাণে ধরে জিনিসগুলো ফেলতেও পারছেন না।"

দীপকাকুর কথায় এবার একটু সময় নিয়ে উত্তর দেন সমীর আঙ্কল, "ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। ভদ্রলোক সুইসাইড করার পর পুলিশ এসে ঘর সার্চ করে, তখনই কিছু ইনশিওরেন্সের কাগজ এবং ওঁর চাকরি-জীবনের কিছু প্রমাণপত্র দেখি। সেগুলো থেকে বিশাল কিছু প্রাপ্তির আশা নেই। তা বড় ছেলেও জানে। সার্চের সময় সে ছিল। মুশকিল হচ্ছে, ওইসব কাগজপত্র ইচ্ছেমতো ফেলে দেওয়া যায় না। হয়তো বা সেটা আইনের চোখেও অপরাধ। তাই কী করব, এখনও ঠিক করতে পারিনি।"

র‍্যাকের বইগুলো দেখতে-দেখতে দীপকাকু বলেন, "ভেরি সিম্প্‌ল। গোটা ব্যাপারটা পুলিশকে জানান। তারাই কোর্টের মাধ্যমে বিষয়টা সমাধান করে দেবে।"

"এবার তাই করতে হবে। আসলে ওয়েট করছিলাম যদি ওঁর ছেলেদের মতি ফেরে।"

সমীর আঙ্কলের কথা শেষ হতে দীপকাকু যেন ঝিনুকের মনের কথাটাই বলে ওঠেন, "আপনাদের নীচের ঘর নিয়ে এরকম একটা জটিলতা আছে, আগে কেন বলেননি?"

"আসলে গ্রেটনিং লেটার, উপরের ঘরে তাণ্ডব— এ দুটোর সঙ্গে এই ঘরের কোনও সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়নি। আপনার কী মনে হয়, আছে?

সমীর আঙ্কলের পালটা প্রশ্নে দীপকাকু বলেন, "হয়তো নেই। আবার থাকতেও পারে। সবটাই আমার জানা দরকার।"

বুক শেল্‌ফের বই, কাগজপত্র দেখার পর নীচের ড্রয়ারগুলো খুলতে শুরু করলেন দীপকাকু। বেশ কিছু ড্রয়ার একদম ফাঁকা। একটা থেকে বেশ ক'টা ফাইল বেরোল। উলটেপালটে দেখে রেখে দিলেন।

পরের ড্রয়ারের গভীরতা কম, নানান ট্যাবলেটের ফয়েল। ওষুধের শিশিতে ভরা। খুবই মনোযোগ দিয়ে সেগুলো দেখলেন দীপকাকু।

বুক শেল্‌ফের পাট চুকিয়ে আবার মেঝেতে হামাগুড়ি দিতে শুরু করলেন। পৌঁছলেন রিডিং টেবিলের সামনে। উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের জিনিসপত্তর দেখতে লাগলেন। সিগারেটের প্যাকেট নেড়েচেড়ে দেখে, অ্যাশট্রেটা টেবিলে উপুড় করে দিলেন। সিগারেটের ফিল্টারগুলো তুলে কী যেন দেখতে লাগলেন। তারপর বললেন, "চলুন, অন্য ঘরগুলো দেখে নিই। এসেছি যখন ..."

শ্রবণার মায়ের আপ্যায়নে ঝিনুকদের সামনে এখন প্রচুর খাবার। এত কিছু খাওয়া ঝিনুকের পক্ষে ইমপসিব্‌ল। দীপকাকু পরিপাটি করে খাওয়া শেষ করলেন। চায়ের কাপ তুলে নিয়েছেন হাতে। ঘরে এখন কাজের লোক ছাড়া সবাই উপস্থিত। সমীর আঙ্কল বলেন, "কী বুঝছেন মিস্টার বাগচী, কোনও ক্লু পাওয়া গেল? কীভাবে উপরের ঘরদুটো খুলল, কোন জিনিসটাকে মূল্যবান বলছে লোকটা, নাকি কোনও ভুল করছে?"

অন্যমনস্ক গলায় দীপকাকু বলেন, "অনেক কিছুই পাওয়া গেল। তবে ভীষণ অস্পষ্ট, আবছা একটা ধারণা তৈরি হচ্ছে। আর ক'টা দিন লাগবে গোটা ব্যাপারটা বুঝতে।"

উদ্বিগ্ন স্বরে শ্রবণার মা বলেন, "চিঠিতে যে মাত্র চারদিন সময় দেওয়া হয়েছে। যদি এর মধ্যে কিছু ঘটে যায়!"

উত্তরে দীপকাকু বলেন, "আপনার মা কিন্তু আপনার চেয়ে সাহসী।"

সোফা ছেড়ে উঠে পড়েছেন দীপকাকু। দেখাদেখি ঝিনুকও উঠে দাঁড়ায়। এবার বোধহয় ফেরার পালা। অতি বিনয়ে সমীর আঙ্কল বলেন, "আপনার চার্জ নিয়ে কোনও কথাই হল না। আসলে এমন পরিচিত সূত্রে এসেছেন ..."

"রহস্যটার ভিতর আর একটু ঢুকি, তারপর সে সব নিয়ে কথা হবে'খন।" বলে, দীপকাকু দরজার দিকে এগোতে যাবেন, এমন সময় অপরাজিতা দেবী বলে ওঠেন, "কিছু অ্যাডভান্স আপনাকে আমাদের দেওয়া উচিত। এই চেকটা আপনার জন্য রেডি করে রেখেছি।"

অপরাজিতা দেবীর বাড়িয়ে ধরা চেকে চোখ বুলিয়ে পকেটস্থ করেন দীপকাকু। তারপর, হঠাৎ মনে পড়েছে এই ভঙ্গিতে বলেন, "ও, ভাল কথা, আপাতত ক'টা দিন কাজের লোকেদের কোনও অবস্থাতেই বাড়ি যাওয়ার ছুটি দেবেন না।"

মাথা হেলিয়ে 'আচ্ছা' বলেন অপরাজিতা দেবী।

শ্রবণার দিদার বাড়ি থেকে গাড়ি করে বেরিয়ে এসেছে ঝিনুকরা। ও বাড়ির গেটও বন্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ আশুদাকে গাড়ি থামাতে বলেন দীপকাকু। গাড়ি থেকে নামতে-নামতে ঝিনুককে বলেন, "পাঁচ মিনিট বোসো, এখনই আসছি।"

খুব রাগ হয় ঝিনুকের। এতক্ষণ সঙ্গে রেখে হঠাৎ আলাদা তদন্তে কেন? একেই তো রহস্যটায় প্রচুর ধোঁয়াশা, আরও অন্ধকারে রেখে চলে গেলেন দীপকাকু। অনেক খাটাখাটনির পর আবিষ্কার হয়েছে মাত্র দুটো আয়তাকার গর্ত। তার বিনিময়ে কত অ্যাডভান্স পেলেন কে জানে! রহস্যটা সমাধান করতে না পারলে শ্রবণাদের কাছে নাক কাটা যাবে ঝিনুকের। — এসব ভাবনার মাঝেই ফিরে এলেন দীপকাকু। গাড়িতে উঠে বললেন, "চলো, যাওয়া যাক।"

গাড়ি একটু গড়াতেই দীপকাকু পকেট থেকে সেলফোন বের করে নম্বর টিপতে লাগলেন। ফোন কানে দিয়ে বললেন, "হ্যালো, রঞ্জন।"

... ...

"দীপঙ্কর বলছি, একটু হেল্প করতে হবে।"

... ...

"না, তেমন বড় কিছু নয়। দুটো অ্যাড্রেস দিচ্ছি, সিক্সটিন এ বাই সি গোকুল বড়াল স্ট্রিট। আর একটা হচ্ছে, থ্রি বাই থ্রি সার্পেনটাইন লেন। এ দুটো বাড়িতে খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে, কোনও নতুন লোক এসেছে কিনা।"

... ...

"হ্যাঁ। রাইট।"

... ...

"ওকে। দু'ঘণ্টা পর।"

... ...

"না না, তুই তো জানিস কলকাতা পুলিশের উপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু কী করব বল, পার্টি চাইছে না এই কেসে পুলিশ আসুক।"

... ...

"জানি না। ব্যাপারটা বুঝতে হবে। ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে অবশ্যই জানাস। ছাড়ছি।" ফোন অফ করে গম্ভীর মুখে বসে রইলেন দীপকাকু। ঝিনুক ফোনের এক প্রান্তের কথা শুনে যতটুকু বুঝেছে, রঞ্জনবাবু পুলিশের লোক। দীপকাকুর বন্ধু। তুইতোকারির সম্পর্ক মানে অনেকদিনের বন্ধুত্ব। ঝিনুক যেটা বুঝতে পারছে না, দুটো বাড়ির নম্বর হঠাৎ এ কেসে কোথা থেকে এল! রাস্তাদুটোর নাম আগে কখনও শোনেনি!

রোদ-ঝলমলে ব্যস্ত ধর্মতলা পিছিয়ে যাচ্ছে। গাড়িতে গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় বসে আছেন দীপকাকু। কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হচ্ছে না, তবু একসময় করেই ফেলে ঝিনুক, "ওই দুটো অ্যাড্রেস কোথাকার?"

"ও বাড়ির পাশের দুটো বাড়ির।"

"সে কী, ঠিকানা দুটো যে একদম আলাদা!"

"মধ্য কলকাতার ওই জায়গাটায় অজস্র লেন, বাই লেন। কুড়ি-পঁচিশ ফুট গলির ভিন্ন একটা নাম। আমার মনে হয় বেঁচে থাকতেই ওখানকার আদি বাসিন্দারা নিজের নামে রাস্তা করে গেছেন।"

এখনও মজা করে যাচ্ছেন দীপকাকু! আর একটু সাহস পায় ঝিনুক। বলে, "ওই দুটো অ্যাড্রেসে নতুন লোক এসেছে কিনা খোঁজ নিচ্ছেন কেন?"

মিটিমিটি হেসে দীপকাকু বলেন, "তুমি একটু ভেবে দ্যাখো তো, বের করতে পারো কিনা?"

ভাবার ভান করে ঝিনুক। সে বিন্দুমাত্র আন্দাজ করতে পারছে না। একটু পরে বলে, "না, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"একটু সময় দিলেই বুঝতে পারতে। তবু আমি উত্তরটা দিচ্ছি, তা হলেই তুমি বুঝতে পারবে কীভাবে ভাবনার শৃঙ্খল সাজিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়। এটা তোমার জন্য একটা স্যাম্প্‌ল।" বলে একটু থামলেন দীপকাকু। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ধরালেন একটা। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, অপরাজিতা দেবীর বারান্দা থেকে মাত্র দুটো বাড়ি দেখা যায়। তোমাকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে আমি দুটো বাড়ির নম্বর জেনে এসেছিলাম। চিঠিতে লেখা ছিল, যদি রাজি থাকেন, নীল শাড়ি পরে বারান্দায় দাঁড়াবেন। সময়ের উল্লেখ ছিল না। অর্থাৎ সারাক্ষণ কেউ ও বাড়ির উপর নজর রাখছে। যা একমাত্র ওই দুটো বাড়ি থেকেই সম্ভব।"

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতে ঝিনুক বলে ওঠে, "হ্যাঁ, আমি দেখেছি নর্থ সাইডের বাড়ির চারতলার একটা বুড়ো এ বাড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল।"

"আমিও দেখেছি। সন্দেহ করার মতো কিছু নেই বলেই আমার মনে হয়, তা হলে ওরকম প্রকাশ্যে এসে দাঁড়াতেন না। তা ছাড়া ভদ্রলোকের বয়স প্রায় আশির কাছাকাছি। সারাদিন ওই ঘরটাতেই থাকেন। জানলায় দাঁড়ানোই তাঁর বিনোদন।"

শুধুমাত্র দূরবিন চোখে লাগালেই যে হয় না, পিছনে একটা উর্বর মস্তিষ্ক থাকা দরকার, সেটা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে ঝিনুক। কিন্তু আর

একটা খটকা যে এই প্রসঙ্গে চলে এল। দীপকাকুর কাছে জানতে চায়, "সামনের দুটো বাড়িতে নতুন লোক আসার কথা কেন ভাবছেন? বাড়ি দুটোর কারও সঙ্গে অপরাজিতা দেবীদের পুরনো ঝগড়াও থাকতে পারে। ওদের মধ্যে কেউ মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছে হয়তো।"

"আশ্চর্য নয়। ওঁরা অনেক কথাই চেপে যাচ্ছেন। তবে প্রতিবেশীর ঝগড়া খুনের হুমকি অবধি সাধারণত গড়ায় না। অপরাজিতা দেবীকে লক্ষ রাখার জন্য ওই দুটো বাড়ির কোনও একটা ঘর ভাড়া নেওয়াই স্বাভাবিক। দেখা যাক রঞ্জন কী খবর দেয়।"

সিগন্যাল পেরিয়ে কখন যে গাড়ি থিয়েটার রোডে এসে পড়েছে, খেয়ালই নেই ঝিনুকের। দীপকাকু থামাতে বলেন। ঝিনুক বুঝতে পারে, দীপকাকু নিজের অফিসে চলে যাবেন। কিন্তু তারপর! ঝিনুক কি তা হলে রহস্য সমাধানের বাইরে চলে যাচ্ছে? প্রবল অনিশ্চয়তায় দীপকাকুকে বলে ওঠে, "শ্রবণাদের কেসটায় আমি কিন্তু ইনভল্‌ভড হয়ে পড়েছি। আমাকে বাদ দিলে হবে না। কখন যোগাযোগ করব বলুন।"

গাড়ি থেকে নেমে ফুটপাথে দাঁড়ান দীপকাকু। মুখে আবার সেই মিটমিটে হাসি। বলেন, "ও কে, তোমাকে সঙ্গে নিয়েই কাজ করব। সামান্য একটু টেস্ট নেব তার আগে। তুমি বাড়ি গিয়ে যা-যা দেখলে, বুঝলে, লিখে ফ্যালো। তার থেকে কী ধারণা হয়, ফোনে জানাও। তারপর ঠিক করব তোমাকে সঙ্গে নেওয়া যাবে কি না, চলি।"

দীপকাকুর হেঁটে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে ঝিনুক। অতল জলে ফেলে দিয়ে গেলেন। যা-যা দেখেছে, সব তো গুলিয়ে যাচ্ছে।

আশুদা গাড়ি চালিয়ে দিয়েছে। রাস্তার দু'পাশে বড়-বড় হোর্ডিং, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম, দুর্দান্ত ড্রেস-করা ছেলেমেয়ে ... অন্যদিন হলে এসবই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখত ঝিনুক। আজ অবিকল দীপকাকুর মতোই গম্ভীর হয়ে পিছনের সিটে বসে আছে।

কিছুক্ষণ গাড়ি চালানোর পর আশুদা সামান্য ঘাড় ফিরিয়ে বলে, "দিদি, তোমরা যখন ও বাড়ির উপরে ছিলে, ওদের একটা কাজের লোক আমার সঙ্গে গল্প করতে এল। বারবার জানতে চাইছিল তোমরা কী কারণে এসেছ? কোথা থেকে এসেছ? আমি অবশ্য এড়িয়ে-এড়িয়ে উত্তর দিয়েছি।"

ঝিনুক উৎসাহিত হয়ে বলে, "লোকটার চেহারার বর্ণনা একটু দাও তো।"

আশুদা বলতে থাকে।

বাড়ি ফিরতেই মা পথ আগলে দাঁড়ালেন। এখনই তাঁকে বলতে হবে শ্রবণার দিদার বাড়িতে কী হল, না হল! কোনওক্রমে পাশ কাটিয়ে ফোনের কাছে যায় ঝিনুক। দীপকাকুর মোবাইলে ডায়াল করে। ও প্রান্তে নম্বর দেখেই দীপকাকু বুঝেছেন, ঝিনুকদের বাড়ির ফোন। বলেন, "হ্যাঁ বউদি, ঝিনুক এক্ষুনি পৌঁছে যাবে। একটু আগে আমাকে অফিসে নামিয়ে দিয়ে গেছে।"

ঝিনুক বিরক্তির সুরে বলে, "আমি ঝিনুক বলছি।"

"সে কী, লেখা হয়ে গেছে সব!" ঠাট্টা করলেন দীপকাকু।

"না, এত তাড়াতাড়ি সেটা সম্ভব নয়, আপনিও বোঝেন। একটা খবর আছে। আশুদা বলছিল, ও বাড়ির কোনও এক কাজের লোক আশুদার কাছে আমাদের খবরাখবর নিচ্ছিল। বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে ..."

কথা শেষ করতে না দিয়ে ও প্রান্ত থেকে দীপকাকু বলে ওঠেন, "জানি, বিনায়ক। দূরবিন দিয়ে দেখার সময় আমারও চোখে পড়েছে। যাই হোক, এই পয়েন্টটাও লিখে রাখো। সব কিছু না-লেখা অবধি আমাকে ফোন কোরো না।"

হতাশ ভঙ্গিতে ফোন নামিয়ে রাখে ঝিনুক। এই কেসটাতে সে এখন অবধি কিছু কন্ট্রিবিউট করে উঠতে পারেনি। ড্রেস চেঞ্জ না করেই নিজের স্টাডিতে গিয়ে বসে। ও বাড়ির দেখাগুলো পরপর সাজাতে গিয়ে, একটা ব্যাপারেই বারবার জড়িয়ে পড়ে, কী এমন মূল্যবান জিনিস অপরাজিতা দেবীর কাছে আছে, যা উনি নিজেও জানেন না! আর অন্য একজনের জিনিসটা ভীষণ দরকার!

## ॥ তিন ॥

পরেরদিন সকালে ঝিনুককে বারবার ফোন করতে যেতে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফেরত আসতে দেখে বাবা জানতে চান, "কী ব্যাপার রে, কাকে সেই থেকে ট্রাই করছিস?"

অস্থির পায়চারি করতে-করতে ঝিনুক বলে, "আর বোলো না, দীপকাকু কাল বিকেল থেকে মোবাইল অফ করে রেখে দিয়েছে। এদিকে আমাকে বলেছে, টোটাল অবজারভেশন এবং তার থেকে যা আইডিয়া হচ্ছে লিখে জানাতে। লেখার সময় দরকার পড়ছিল দীপকাকুকে কনট্যাক্ট করার, ডায়াল করলেই বলছে সুইচ্‌ড অফ। এখনও একটা ইনফর্মেশন নেওয়া বাকি।

বাবা আক্ষেপের সুরে বলেন, "তুই তো আমারও ক্ষতি করে দিয়েছিস। কালও দাবা খেলতে আসেনি দীপঙ্কর। আজও মনে হয় আসবে না। ওরকম একটা ট্যালেন্টেড প্লেয়ারের মাথায় কেউ ওইসব বাজে ঝামেলা ঢোকায়, ঘরে তালা দেওয়া অথচ ভিতরে সব ওলটপালট। সব জানবি পুরনো বাড়ির ভূতের কাণ্ড।

বাবার সহজ সমাধান শুনে হেসে ফেলে ঝিনুক। মনটা একটু হালকা হয়ে যায়। বাবা বলেন, "শোন, তোকে একটা টিপস দিই। ফোনে কাউকে পেতে হলে ফোনসেটের সামনে গিয়ে মনে-মনে তার চেহারাটা একবার চিন্তা করবি। যদি নির্ভুল হয়, কানেকশন তুই পাবিই।"

ঝিনুক জানে, এটা বাবার ফ্রেশ হোমমেড কুসংস্কার। বাবা নিজেই এখনও ব্যবহার করেননি। তবু কেন জানি এই সময় বাবাকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। ফোন স্ট্যান্ডের সামনে গিয়ে চোখ বুজে মনে মনে দীপকাকুর চেহারাটা একবার কল্পনা করে ঝিনুক। অদ্ভুত একটা ছবি ভেসে ওঠে, দীপকাকুর চশমার একটা কাচ দূরবিনের মতো সুচলো, অন্যটা আতস কাচ। এক হাতে ঝুলছে ইঞ্চি ফিতে, অন্য হাতে জ্বলন্ত টর্চ। চুল উসকো-খুসকো। পকেটের মোবাইলটা বিদঘুটে শব্দে বাজছে।

"ধুত্তেরি", বলে রিডায়াল সুইচ টিপে দেয় ঝিনুক। এবং কী আশ্চর্য, ওপারে রিং হচ্ছে! —কেটে না দেন, কেটে না দেন, কথাটা মনে-মনে আওড়াতে থাকে ঝিনুক।

অবশেষে ধরেন দীপকাকু, "হ্যাঁ বলো!"

ঝিনুক বলে, "আমার সব লেখা হয়ে গেছে। শুধু একটা ইনফর্মেশন চাই। আপনার বন্ধু কী বলছে, সামনের দুটো বাড়িতে কোনও নতুন লোক এসেছে?"

"না। তুমি যা-যা লিখেছ, তার থেকে শুধু অনুমানগুলো ছোট করে বলো।"

"একটু ধরুন, বলছি।" বলে ফোনসেটের পাশে রাখা নিজের হাতে লেখা চিরকুটটা তুলে ধরে ঝিনুক। ফোনের ও প্রান্তে গাড়ির হর্ন, হাতেটানা রিকশার টুংটাং। দীপকাকু এখন তার মানে রাস্তায়। ঝিনুক বলে, "শুনুন, নম্বর ওয়ান, দুষ্কৃতী কোন কায়দায় ঘরে ঢুকেছিল বোঝা যাচ্ছে না। ঘরে ক'জন ঢুকেছিল এখনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। গয়নাগাঁটি অথবা অন্য কিছুর উপর তার বা তাদের কোনও আগ্রহ ছিল না। দুটো ঘরের কিছুই খোয়া যায়নি। তা হলে কী নিতে এসেছিল?

"পয়েন্ট টু, বাড়ির কাজের লোকেদের অবিশ্বাস করা যাচ্ছে না। ড্রাইভার রঘুকে তো নয়ই। ঘটনার সময় সে অপরাজিতা দেবীর সঙ্গে ছিল। বাকি দু'জন বয়স্ক এবং বিশ্বস্ত। তিনজনের এখন পর্যন্ত কাজে কোনও ব্যাড রেকর্ড নেই।"

ও পাশ থেকে দীপকাকু বলেন, "আত্মীয়-স্বজন, মানে শ্রবণার বাবা, মা। অপরাজিতা দেবীর অন্য দুই কন্যা, জামাই?"

"তাঁদের আমি চিনি না। তবে শ্রবণার বাবা, মা কিছুতেই

অপরাজিতা দেবীকে লাইফ থ্রেটনিং চিঠি দেবেন না। ওঁদের আমি চিনি।"

"মানুষকে চেনা অত সহজ নয়। তবু বলে যাও।" অপর প্রান্ত থেকে বলেন দীপকাকু।

ঝিনুক বলে, "থার্ড পয়েন্ট, নীচের গেস্টরুম নিয়ে যথেষ্ট জটিলতা থাকলেও, অপরাজিতা দেবীর বিপদের সঙ্গে তেমন কোনও সম্পর্ক নেই। ব্যস, এইটুকু। আর একটা ছোট্ট খটকা আছে আপনার ইনভেস্টিগেশন নিয়ে।"

"যেমন?" জানতে চান দীপকাকু।

ঝিনুক বলে, "আপনি শোওয়ার ঘরটা আবার ওলটপালট করতে বললেও, ড্রইংরুমটা বলেননি। কেন?"

"কারণ, শোওয়ার ঘরে আলমারি, বই, পেন্টিং, ... এরকম বিভিন্ন ধরনের জিনিস ছিল। সেগুলো কীভাবে ঘাঁটা হয়েছে দেখে বোঝা যাবে দুষ্কৃতী কোন ধরনের জিনিস খুঁজছিল। ড্রয়িংরুমে আইটেম কম। সেখানে যা আছে, শোওয়ার ঘরেও ছিল। বাড়তি খাঁটনি হত আমাদের।" বলে, একটু থামলেন দীপকাকু। সেই ফাঁকে ওপারের ফোনে ঝিনুক শুনতে পেল কিছু লোকের গলার আওয়াজ। দীপকাকু ফের বলেন, "তোমার অবজারভেশন অত্যন্ত সাধারণ মানের। এই কেসটায় তুমি তেমন কিছু হেল্প করে উঠতে পারবে না। কম্পিউটার ক্লাস, আড্ডা এসব নিয়েই তোমার থাকা ভাল। রজতদাকে বোলো, দিনচারেকের মধ্যে প্রবলেমটা সল্‌ভ করে, আবার দাবা খেলতে যাব। ছাড়ছি।"

যথেষ্ট অপমানজনক মন্তব্য। অন্য সময় হলে নির্ঘাত কেঁদে ফেলত ঝিনুক। কিন্তু এখন তার মুখে অদ্ভুত খুশির ভাব। রিসিভার রেখে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, বাবা বলেন, "কী ব্যাপার, হাসছিস যে বড়!"

ঝিনুক বলে, "আমি আশুদাকে নিয়ে এক্ষুনি বেরোচ্ছি। তুমি আজকেও ট্যাক্সি নিয়ে অফিস যেও।"

"সে তো বুঝলাম। কিন্তু যাচ্ছিস কোথায়? তা ছাড়া মাকে বলবি তো!"

"দীপকাকুর কাছে যাচ্ছি। তুমি মাকে ম্যানেজ দিও।" বলে পা টিপে বেরিয়ে যায় ঝিনুক।

আধঘণ্টার মধ্যেই ক্রিক রো পৌঁছে গেল ঝিনুক। শ্রবণার দিদার বাড়ির বেশ কিছুটা আগে আশুদাকে গাড়ি রাখতে বলে নেমে আসে। ও বাড়ির পাঁচিল-লাগোয়া চা-দোকান লক্ষ করে এগিয়ে যায়। অস্থায়ী চালার নীচে সার দেওয়া বেঞ্চ। সেখানে ইতস্তত কিছু লোক বসে আছে। ঝিনুকের মতো ইয়াং স্মার্ট মেয়েকে এই টাইপের দোকানে ঢুকতে দেখে কাস্টমারদের চোখে বিস্ময়।

চা বানানো মুলতুবি রেখে দোকানি বলে, "বলুন দিদিভাই, কী চাই এখানে? কাকে খুঁজছেন?"

ঝিনুকের চোখের তারা এখন চারপাশে ঘুরছে, ভুল হয়ে গেল না তো? তখনই চোখে পড়ে, চা-দোকানের শেষে বাইরের দিক করে বসে থাকা একজন নিউজ় পেপারে মুখ ঢাকছে। দোকানির কথার জবাব না দিয়ে ঝিনুক পেপার ঢাকা লোকটার সামনে গিয়ে বলে, "দীপকাকু আমি এসে গেছি।"

মুখের সামনে থেকে পেপারটা নামিয়ে রাখল যে, তাকে দেখে মুহূর্তের জন্য বুকটা ধক করে ওঠে, দাড়ি, গোঁফ পাঞ্জাবিতে লোকটা কে? পরক্ষণেই দীপকাকুর হাসি চিনতে পেরে আশ্বস্ত হয় ঝিনুক। তার মানে ছদ্মবেশ। চশমার ফ্রেমটাও অন্যরকম। দীপকাকু বলেন, "বোসো। আমি জানতাম তুমি বুঝতে পেরে চলে আসবে।"

টেবিলে মুখোমুখি বসতে-বসতে ঝিনুক বলে, "অমনি আপনি জানতেন, না? বলুন তো কী করে বুঝলাম আপনি এখানে?"

"ওইটুকু গ্রে ম্যাটার মাথায় না থাকলে, তুমি প্রতি বছর ভাল মার্কস নিয়ে ক্লাসে উঠতে পারতে না। আমার টেলিফোনে তুমি গাড়ির আওয়াজ পাচ্ছিলে, রিকশার ঘন্টি শুনে আন্দাজ করলে পুরনো কলকাতার গলি। আশেপাশে মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে বুঝলে, রাস্তার পাশেই কোনও দোকানে ঢুকেছি। লাস্ট অফ অল ব্লাভার করল ওই মাইকের কেত্তন। হঠাৎ শুরু হল ওটা। তুমি আগের দিন জেনেছিলে শিবরাত্রির ক'দিন প্রায়ই মাইক বাজিয়ে নামগান করে ওরা।"

ঝিনুক খুব হাসে। বলে, "তা হলে মানছেন তো, কিছু যোগ্যতা আছে। এবার বলুন, কেন এখানে, এরকম ছদ্মবেশে বসে আছেন?"

"বলছি, তোমার কিন্তু এরকম আগের দিনের ড্রেসে হুট করে চলে আসা ঠিক হয়নি। যাদের ওয়াচ করছি, সতর্ক হয়ে যাবে।"

দীপকাকুর কথা শুনে নিজেকে অপরাধী লাগে ঝিনুকের। বলে, "আশুদাকে দূরে গাড়ি লাগাতে বলেছি। কাদের ওয়াচ করছেন আপনি?"

"ওরে বাবা আবার গাড়ি নিয়েও এসেছ।" হতাশ সুরে বলেন দীপকাকু।

মিয়নো গলায় ঝিনুক বলে, "কাদের ওয়াচ করছেন বলুন না?"

দু'জনের মাঝে টেবিলে চায়ের গ্লাস রাখে দোকানি। দীপকাকুর দিকে তাকিয়ে বলে, "দিদিভাই যে আপনার লোক বুঝতেই পারিনি।" তারপর ঝিনুককে বলে, "সরি, কিছু মনে করবেন না। চা দেব নাকি আপনাকে?"

ঝিনুক মাথা নাড়ে। দোকানি চলে যায়। ঝিনুক বলে, "দোকানদার আপনাকে আগেই চিনত নাকি?"

"না, আজ সকালেই আলাপ। পুলিশের লোক বলে জানে। পুলিশের এত অল্পবয়সী অ্যাসিস্ট্যান্ট হয় না বলেই তোমাকে সন্দেহ করেছিল।"

কথার ঝোঁকে দীপকাকু অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে তাকে মেনে নিচ্ছেন দেখে মনে-মনে আহ্লাদিত হয় ঝিনুক। আগের প্রসঙ্গ ফিরিয়ে দিয়ে বলে, "বললেন না তো, কাদের ওয়াচ করছেন?"

"ও বাড়ির সবাইকে। কে কখন বেরোচ্ছে, ঢুকছে। কোনদিকে যাচ্ছে, আসছে — সব। একটু আগে অপরাজিতা দেবীর অন্য এক মেয়ে স্বামী, পুত্রকন্যা সমেত গাড়ি করে ঢুকল।"

"আপনার সন্দেহের তিরটা বারেবারেই কেন অপরাজিতা দেবীর মেয়েদের দিকে যাচ্ছে? তেমন যদি কিছু জিনিস থেকেই থাকে, অপরাজিতা দেবী নিজে জানবেন, মেয়েরাও জানবে। মায়ের মৃত্যুর পর জিনিসটা তাদেরই হবে। এমনকী মায়ের সঙ্গে তাদের যা সম্পর্ক, মৃত্যু অবধি অপেক্ষা করতে হবে না। চাইলেই পেয়ে যাবে। কিন্তু আসল কথা হল, জিনিসটার অস্তিত্ব আদৌ আছে কিনা?"

রাস্তার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক গলায় দীপকাকু বলেন, "আছে। এমন হতেই পারে জেনেও না জানার ভান করে যাচ্ছেন অপরাজিতা দেবী।"

"কারণ?" জানতে চায় ঝিনুক।

"জিনিসটা হয়তো বেআইনি কিছু। সেই কারণেই উনি পুলিশকে এড়িয়ে যাচ্ছেন।"

"ওরে বাবা, আপনি দেখছি খোদ মক্কেলকেই সন্দেহ করছেন।" বলে ঝিনুক।

দীপকাকু বলেন, সন্দেহের তালিকার বাইরে আমি কাউকেই রাখছি না। যেমন, আশেপাশের বাড়ির উপর আমার সমান নজর আছে। একটা বিষয় তুমি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ, হুমকির চিঠি পেয়েও অপরাজিতা দেবী তেমন ভয় পেয়ে যাননি। আমার ধারণা, চিঠি কে দিচ্ছে উনি জানেন। এবং এ কথাও জানেন, প্রেরক যতই হুমকি দিক, খুন করবে না। এ ক্ষেত্রে মেয়েদের কথাই প্রথমে মনে আসে। আমার ধারণা পাশের দুটো বাড়ির সঙ্গে মেয়েদের যেহেতু পুরনো পরিচয় আছে, নীল শাড়ি পরে মা কখন বারান্দায় দাঁড়ায় দেখার জন্য, মেয়েরাই দু' বাড়ির কাউকে ফিট করতে পারে।"

কেসটা এবার সত্যিই ভীষণ জটিল মনে হচ্ছে ঝিনুকের। কেন জানি অপরাজিতা দেবীর মেয়েদের অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। হয়তো মেয়েদের পক্ষ নিয়েই ঝিনুক বলে ওঠে, "মেয়েরা যখন জানে জিনিসটা বেআইনি, তবু তারা পেতে চায়। সেটা অপরাজিতা দেবী বুঝতে পারছেন, তা হলে তিন মেয়েকে ভাগ করেই দিতে পারেন জিনিসটা।"

উত্তরে দীপকাকু বলেন, "কেসটার এটাই কেন্দ্রবিন্দু। তুমি মোটামুটি ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছেছ। কথা হচ্ছে, বস্তুটি এমন কিছু, যা টুকরো করা যায় না, মানে সোনার তাল, হিরের হার এসব কিছু নয়। জিনিসটা বিক্রি করতে গেলে ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। কোনও এক জামাইকে বিশ্বাস করে জিনিসটা বিক্রি করতে দিতে পারছেন না অপরাজিতা দেবী। আবার এটাও হতে পারে জিনিসটা তিনি বিশেষ কারণে আড়ালে রাখতে চাইছেন। বিক্রি করার ইচ্ছেই নেই।"

উলে ফাঁস লেগে গেলে যেমন হয়, ঝিনুকের মাথার অবস্থা এখন তেমনই। চা শেষ করে দীপকাকু এখন উদাসভাবে সিগারেট ধরিয়েছেন। ঠিক যেন নন্দন চত্বরে বসে থাকা কোনও কবি। ঝিনুক এখন নন্দন লেকের অগাধ জলে। কিছুক্ষণ এভাবে কাটার পর ঝিনুক লক্ষ করে দীপকাকুর ভ্রূ দুটো ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। সিগারেটটা মাটিতে ফেলে উঠে দাঁড়ান দীপকাকু। তারপর আচমকা বেঞ্চ ডিঙিয়ে সোজা রাস্তায়। দীপকাকুর গতিবিধি লক্ষ করতে গিয়ে ঝিনুকের চোখে পড়ে আর একজনকে। একটু দূরে হেঁটে যাচ্ছে অপরাজিতা দেবীর ড্রাইভার রঘু। একটু আগেই ক্রস করেছে চায়ের দোকান। তারপর দীপকাকু বাইরে যান।

ঝিনুক নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে আসতে গিয়ে দেখে, দীপকাকু অনেকটা দূরত্ব রেখে ফলো করছেন রঘুকে। ঝিনুক চা-দোকানের বাইরে আসে। এখন দীপকাকুর পাশে যাওয়া ঠিক হবে না। কাজের ব্যাঘাত হবে। রঘু একবার ঘাড় ফেরাল পিছনদিকে। ঝট করে মুখ ঘুরিয়ে হাঁটার গতিমুখ অন্যদিকে করে নিলেন দীপকাকু। রঘু তার মানে অন্যায় কোনও কাজ করতে যাচ্ছে, পিছন ফিরে দেখে নিচ্ছে কেউ নজর রাখছে কিনা।

বেশিদূর গেল না রঘু। রাস্তার পাশে একটা টেলিফোন বুথে ঢুকে পড়ল। বুথের কাচের দরজা দিয়ে রঘুকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ঝিনুক। ডায়াল করার আগে রঘু আর একবার পিছনে ফিরল। মাথা নিচু করে বুথের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন দীপকাকু। কিন্তু কাছাকাছি যাচ্ছেন কেন? রঘু তো চিনতে পেরে যাবে। যদিও দীপকাকু এখন ছদ্মবেশে, এই যা ভরসা। ঝিনুক টের পায়, উত্তেজনার বশে তার ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। দীপকাকু একদম কাচের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। পকেট থেকে নোটবুক বের করে কী যেন লিখছেন। দীপকাকু দ্বিতীয়বার কাচের দরজার উপরে তাকাতেই ঝিনুক বুঝতে পারে, ডিজিটাল বোর্ড থেকে রঘু যাকে ফোন করছে, তার নম্বরটা লিখে নিচ্ছেন দীপকাকু। ঝিনুকের বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা এবার লাফাতে শুরু করেছে, খালি মনে হচ্ছে এগিয়ে যায়। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রেখেছে। সে তো ছদ্মবেশে নেই।

মিনিটখানেকের মধ্যে ঘটনাটা ঘটে গেল। দীপকাকু নম্বর লিখে নোটবুকটা পকেটে রাখতে যাবেন, বেরিয়ে এল রঘু। ও বোধহয় দেখে নিয়েছে দীপকাকু নম্বর লিখেছেন। প্রথমে ঝাঁঝিয়ে প্রশ্ন করল দীপকাকুকে। তারপর সম্ভবত ছদ্মবেশের আড়ালে আসল মানুষটিকে চিনে ফেলে সজোরে ধাক্কা মেরে ছুটতে লাগল।

ব্যাপারটা বুঝতে যা একটু সময় লেগেছে, ঝিনুকও ছুটতে শুরু করেছে রঘুকে লক্ষ করে। স্প্রিন্ট সে খারাপ টানে না। স্কুলে ফার্স্ট অথবা সেকেন্ড প্রাইজ বাঁধা ছিল। ক্রমশ দূরত্ব কমছে রঘুর সঙ্গে। দৌড়তে-দৌড়তে রঘু একবার পিছনে ফিরল, অনুসরণকারী পালটে গেছে দেখে, একটু থতমত খেয়ে দৌড় শুরু করল ফের। ফলে দূরত্ব আরও কমল। রঘুও খারাপ দৌড়য় না। দীপকাকু এখন কী অবস্থায়, কে জানে। বিচ্ছিরিভাবে ধাক্কা মেরেছে, যদি মারাত্মক কোনও আঘাত পান। কানের পাশ দিয়ে গরম হাওয়া ছুটে যাচ্ছে। পথচারীরা এই দৃশ্য দেখে নিশ্চয়ই থমকে গেছে। ঝিনুকের কোনও হুঁশ নেই। সে শুধু রঘুর ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে, দূরত্ব আর একটু কমে গেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু একটু যেন তফাত থেকেই যাচ্ছে। অবশেষে কারাটে ক্লাব থেকে শেখা প্রাথমিক একটা স্ট্রোক মারে ঝিনুক, দৌড়তে-দৌড়তে উড়ে গিয়ে বাঁ পা বাড়িয়ে দেয়।

যা আশা করেছিল, তার চেয়ে একটু বেশিই হল। হুড়মুড়িয়ে ফুটচারেক দূরে ছিটকে পড়ল রঘু। ঝিনুকও বিচ্ছিরিভাবে পপাত ধরণীতল। চারদিকে ধুলো উড়ছে। রাস্তায় বসেই ঝিনুক বুঝতে পারে, কী বোকার মতো কাজ করল। রঘুর দূরত্ব বাড়িয়ে দিয়ে তাকে পালাতে সাহায্য করেছে। রঘু মাটি থেকে উঠে বাঁ পাশের একটা গলিতে উধাও হয়ে গেল।

ঝিনুকের উঠে দাঁড়াতেই বেশ কষ্ট হচ্ছে। ভীষণ জ্বালা করছে ডান হাতের কনুই। ভালই লেগেছে মনে হচ্ছে।

কোনওক্রমে উঠে দাঁড়াতেই ঝিনুক দেখে, তাকে ঘিরে ছোটখাটো ভিড় তৈরি হচ্ছে। কেউ জিজ্ঞেস করছে, কী হয়েছিল, ওভাবে তাড়া করছিলে কেন? কেউ জানতে চাইছে, ছিনতাইবাজ কিনা? সবার কথাই অসহ্য ঠেকছে ঝিনুকের কাছে। এ সময় যে মানুষটার সবচেয়ে আগে আসা দরকার, তাঁর দেখা নেই। তাঁর ইনজুরি কী সিরিয়াস! আশুদাই বা কোথায় গেল? নিশ্চয়ই গাড়িতে বসে ঘুমোচ্ছে।

ডান হাতের কনুইটা কতটা জখম হল দেখতে গিয়ে ঝিনুক টের পায়, ব্যাপারটা বেশ কঠিন। ভিড়ের মধ্যে কোনও একজন বলে, "এঃ, অনেকটা কেটে গেছে। রক্ত বেরোচ্ছে।"

লোকটার কথার সঙ্গে-সঙ্গে বাঁ হাতটা ডান কনুইয়ে চলে যায়। আঙুলে ভেজা-ভেজা ঠেকে। এই প্রথম ভয় পেয়ে যায় ঝিনুক। মাকে কী উত্তর দেবে!

তখনই কে যেন ঝিনুকের হাত ধরে টান মারে। ঘুরে তাকাতেই দেখে, দীপকাকু। চেহারায় কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। ঝিনুকের কনুইয়ের উপরটা ধরে হাঁটতে শুরু করেছিলেন দীপকাকু। পিছন-পিছন ভিড়টা আসছে দেখে, লোকগুলোকে ধমকে ওঠেন, "কী হল, আপনারা কেন? যান, যে যার নিজের কাজে যান।"

খুবই হতাশ হল কৌতূহলী জনতা। ধমকের চোটে মানে মানে কেটে পড়ল। খুঁড়িয়ে হাঁটছে ঝিনুক। একটু এগোতেই পাওয়া গেল কর্পোরেশনের কল। অহরহ জল পড়ে যাচ্ছে। দীপকাকু হাত ছাড়েননি, সোজা জলের নীচে গিয়ে ধরলেন ঝিনুকের কনুই। চিরচির করে কাটা জায়গাটা ফের জ্বলে উঠল। ফিরে এল অভিমান। ঝিনুকের বলতে ইচ্ছে করছিল, কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? গলা আটকে আসছে। উলটে দীপকাকু বলে ওঠেন, "অযথা দৌড়তে গেলে, ওকে ধরা যেত না।"

"কেন?" রাগের সুরে জানতে চায় ঝিনুক।

হাতটা ছেড়ে দিয়ে দীপকাকু বলেন, "রঘুও ভাল অ্যাথলিট। ওর ঘর সার্চ করার সময় দু'চারটে মেডেল দেখেছি। আমিও হয়তো ওর সঙ্গে দৌড়ে পারতাম না।"

ঝিনুকের ঠোঁটে বাঁকা হাসি খেলে যায়। মনে-মনে বলে, "আপনিও বুঝি ভাল দৌড়ন। জানতাম না তো!"

হাসিটা খেয়াল করেননি দীপকাকু। বলেন, "চলো ফার্স্টএড আর একটা টেটভ্যাক ইঞ্জেকশন নিতে হবে।"

লেনিন সরণির একটা ওষুধের দোকানে ফার্স্টএড নিচ্ছে ঝিনুক। কম্পাউন্ডার সাদা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছেন কনুইয়ে। দীপকাকু অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে আছেন রাস্তার উপর। ঝিনুক বলে, "এখন নিশ্চয়ই আমরা অপরাজিতা দেবীর বাড়ি যাব। রঘুর ব্যাপারে সতর্ক করতে হবে।"

"সে পরে গেলেও চলবে। আপাতত ও বাড়িমুখো হবে না রঘু।"

ঝিনুকের ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে। দোকানদার কয়েকটা ওষুধ

দেন। সম্ভবত পেনকিলার। বিল মিটিয়ে দিলেন দীপকাকু। ঝিনুকরা রাস্তায় নেমে দাঁড়ায়। দীপকাকু বলেন, "তোমাদের গাড়িটা কিন্তু আরও ঘন্টাখানেকের জন্য লাগবে। রজতদার অসুবিধে হবে না তো?"

"হবে না। আমরা এখন কোথায় যাব?" জানতে চায় ঝিনুক।

দীপকাকু বলেন, "লালবাজার।"

"কেন, পুলিশের কাছে কেন? অপরাজিতা দেবী কিন্তু চাইছেন না পুলিশ কেসটাকে হ্যান্ডল করুক।" শর্তটা খেয়াল করিয়ে দেয় ঝিনুক।

দীপকাকু বলেন, "দরকারমতো পুলিশের সাহায্য নেওয়াই উচিত। অপরাধ দমনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে পুলিশ। তাদের বাদ দিই কীভাবে।"

গোমড়ামুখে হাঁটতে থাকে ঝিনুক। দীপকাকুর কথাটা তার মনে ধরেনি। রহস্যটা তারাই সমাধান করে ফেলবে এরকম একটা ধারণা হয়েছিল। পুলিশের দ্বারস্থ হওয়া মানে, সাফল্য অর্ধেক হয়ে যাওয়া।

দেখতে-দেখতে গাড়ির কাছে পৌঁছে গেল ঝিনুকরা, এবং দেখে, সত্যিই পিছনের সিটে শুয়ে দিব্যি ঘুম লাগিয়েছে আশুদা।

লালবাজারের ভিতরটা যে এত বড়, কোনও ধারণাই ছিল না ঝিনুকের। সত্যিই কি কোনও এককালে বাজার বসত এখানে? তবে বাজার বলতে যেরকম হইচই বোঝায়, এখানে কিন্তু একদম তা নয়। সবাই ভীষণ সিরিয়াস এবং কর্মব্যস্ত। একসঙ্গে এত পুলিশ, বড়-বড় প্রিজন ভ্যান দেখলে যে কোনও সৎ, সত্যবাদী মানুষও ঘাবড়ে যাবে। নকল দাড়িগোঁফ, চশমার ফ্রেম বদলে দীপকাকু এখন আগের চেহারায়। গাড়িতে আসতে-আসতে লালবাজার যাওয়ার কারণটা জানতে চেয়েছিল ঝিনুক। দীপকাকু যা বলেছেন, খুবই রোমাঞ্চকর। ধাক্কা মেরে রঘু পালিয়ে গেলেও, দীপকাকু গ্রাহ্য করেননি। রাস্তা থেকে উঠে টেলিফোন বুথে ঢোকেন। রিডায়াল সুইচ টিপতেই ও পারের ফোন বাজে। নম্বরটা মোবাইল ফোনের। ও প্রান্তের পুরুষ কণ্ঠ চাপাস্বরে বলে, "কী হল, আবার ফোন করছ কেন? সব তো বুঝিয়ে বললাম।"

এদিক থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে ও প্রান্তের ফোন অফ হয়ে যায়। এর থেকে বোঝা গেল, কেউ একজন রঘুকে কাজে লাগিয়েছে। ধরেই নেওয়া যায় লোকটা বাঙালি। বাংলা উচ্চারণে কোনও আড়ষ্টতা ছিল না। পরক্ষণেই দীপকাকু বন্ধু রঞ্জনকে ফোন করে লিখে রাখা নম্বরটা দেন। বলেন, মোবাইল ফোনের কোম্পানিতে খোঁজ করতে, কানেকশনটা কার নামে নেওয়া। — এ সব করতে যা একটু সময় লেগেছিল দীপকাকুর। ততক্ষণে ঝিনুক মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

ঝিনুকরা এখন যে ঘরে এসেছে, সেটা লালবাজার কন্ট্রোল রুম। একসঙ্গে এত ফোন আগে কখনও দেখেনি ঝিনুক। একরাশ ফোন নিয়ে একজন ইনস্পেকটর বসে আছেন। একটা না-একটা ফোন বেজেই যাচ্ছে। আশ্চর্য দক্ষতায় যে ফোনটা বাজছে, সেটাই তুলে ধরছেন ইনস্পেকটর। গুলিয়ে যাচ্ছে না।

ঝিনুকদের দেখে ইনস্পেকটর হাত তুলে ডেকে নিলেন, নিশ্চয়ই রঞ্জনবাবু। ভদ্রলোকের মুখে আড্ডা মারার হাসি। লালবাজারে ইনিই বোধহয় একমাত্র হাস্যমুখ অফিসার। ঝিনুকরা ওঁর টেবিলের সামনে যেতে দীপকাকুর উদ্দেশে বললেন, "কী রে দীপঙ্কর, মুখ দেখে মনে হচ্ছে ভালই প্যাঁচে পড়েছিস। তার উপর পাজামা-পাঞ্জাবি। ছদ্মবেশ নিয়েছিলি?"

বিষণ্ণমুখে চেয়ারে বসেন দীপকাকু। ঝিনুককেও ইশারা করেন বসতে। রঞ্জনবাবু বলেন, "অ্যাসিস্ট্যান্টটি তো ভালই পেয়েছিস দেখছি। ইতিমধ্যেই রহস্য অভিযানের ছাপ হাতে পড়ে গেছে।"

ঝিনুক লাজুক হাসে। দীপকাকু বলেন, "হ্যাঁ, আলাপ করিয়ে দিই। এ হচ্ছে ঝিনুক। আমার পাড়ার এক দাদার মেয়ে। প্রায় জোর করে এই তদন্তে আমাকে সাহায্য করতে নেমে পড়েছে।"

ঝিনুকের বলতে ইচ্ছে করছিল, কেসটা কিন্তু আমিই দিয়েছি।

এখানে সেটা বলা মানায় না। ফলে আগের হাসিটাই মুখে ধরে রাখে। দীপকাকু আসল প্রসঙ্গে ফিরে যান। রঞ্জনবাবুকে জিজ্ঞেস করেন, "কিছু ট্রেস করতে পারলি?"

"পেরেছি। তবে কাজ হবে না তোর। কানেকশনটা মিথ্যে নামে নেওয়া, রাজেশ সাংভি। অ্যাড্রেসটাও ঝুটো।"

"কোথাকার অ্যাড্রেস?" জানতে চান দীপকাকু।

"বউবাজারের ইমপ্রেশন নামে একটা সাইবার কাফের। মালিক একজন ইয়াং ছেলে, সৌগত ভট্টাচার্য। তারও মোবাইল সেট আছে। সেটা অন্য কোম্পানির।"

ঝিনুক অবাক হয়ে ভাবে, সত্যি কত তাড়াতাড়ি এত ইনফর্মেশন জোগাড় করে ফেলল লালবাজার কন্ট্রোল! পুলিশের উপর ভরসা রাখাই যায় তা হলে। অযথা পুলিশের বদনাম করে লোকে।

কী একটু ভেবে নিয়ে দীপকাকু বলেন, "মোবাইল সেটটা এখন কোথায়, কোন অঞ্চলে আমাদের কল রিসিভ হয়েছিল, বলতে পারছে কোম্পানি?"

"সেটটা এখন কোথায়, ট্রেস করা যাচ্ছে না। কোনওভাবে ডিসকানেক্ট করে দিয়েছে। তবে কাজের লোকটা এবং তুই যখন ফোন করেছিলি, কল রিসিভ হয়েছিল সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ অঞ্চলে।"

ঝিনুক অবাক হয়ে ভাবে, টেকনোলজি কোথায় পৌঁছে গেছে! এর সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে অপরাধীকেও জবরদস্ত হতে হবে। এরই মধ্যে বেশ ক'টা ফোন রিসিভ করলেন রঞ্জনবাবু। মেঝের দিকে তাকিয়ে গভীরভাবে কী যেন চিন্তা করছেন দীপকাকু। হঠাৎ ঘোর ভেঙে রঞ্জনবাবুকে বলেন, "তালতলা থানার ওসি-র সঙ্গে আমার একবার আলাপ করিয়ে দিতে পারবি?"

"তা কেন পারব না। পার্থ ওখানকার ওসি। আমরা একসঙ্গেই পুলিশের চাকরিতে ঢুকেছিলাম। খুব ভাল ছেলে। অনেস্ট পুলিশ অফিসার।" একটু থেমে রঞ্জনবাবু জানতে চান, "হঠাৎ তালতলা থানা কেন?"

দীপকাকু বলেন, "আমার মক্কেলের বাড়ি ক্রিক রো-তে। তালতলা থানার আন্ডারে। ওসি পার্থকে আমার কাজে লাগবে। যাক, এখন উঠি।"

দীপকাকুর দেখাদেখি ঝিনুকও উঠে দাঁড়ায়। রঞ্জনবাবু ঝিনুককে বলেন, "তোমার ভাল নাম নিশ্চয়ই ঝিনুক নয়?"

"না, আঁখি সেন।"

"বাঃ। সুন্দর নাম। কিন্তু কথা হচ্ছে, এরকম ঝুঁকিপূর্ণ হবি তুমি বেছে নিলে কেন? টাইমপাস করার জন্য আরও কত কিছুই তো ছিল। নাচ, গান, ডিবেট, ফ্যাশন..."

"সেগুলোতে এরকম থ্রিল নেই।" গর্বের সঙ্গে বলে ঝিনুক।

কথার পিঠে দীপকাকু বলেন, "না রে, এটাই ওর লাস্ট চান্স। আর সঙ্গে নেব না। ভীষণ ছটফটে।"

আর একটা ফোন রিসিভ করে রঞ্জনবাবু বলেন, "তুই চিন্তা করিস না। ক'দিন পর ওর গার্জেনরাই আর অ্যালাউ করবেন না। আমাদের দেশে কে আর স্বেচ্ছায় মেয়েকে এসব কাজে ঠেলে দেয়।"

ঝিনুক বলে ফেলে, "আমার মা একটু ভিতু প্রকৃতির হলেও, বাবা কিন্তু মোটেই তা নন। বাবা ছিলেন প্যারাট্রুপার। আগ্রায় আকাশগঙ্গা ফ্রন্টের এক্স-কমান্ডার।"

কথাটা শুনে বেশ খানিকটা সম্ভ্রম দেখা দিল রঞ্জনবাবুর মুখে। দীপকাকু বলেন, "আমার সেই রজতদাকে দেখলে তুই এখন বুঝতে পারবি না, এককালে কী সাঙ্ঘাতিক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। এখন আয়েসি বাঙালি। ছোটখাটো একটা সিকিউরিটি এজেন্সি আছে। আর দাবা খেলতে খুব ভালবাসে।"

আবার ফোন বেজে ওঠে। সম্ভ্রমের ঘোর নিয়েই রিসিভার তোলেন রঞ্জনবাবু। ইশারায় 'চলি' বলে বেরিয়ে যান দীপকাকু। ঝিনুক পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই দীপকাকু বলেন, "কেসটার পঁচিশ ভাগ এগোতে না এগোতে এত কনফিডেন্স নিয়ে কথা বলছ!"

মৃদু তিরস্কারের যথার্থতা অনুভব করে ঝিনুক বলে, "সরি।"

বাড়ির উদ্দেশ্যে গাড়ি চালিয়েছে আশুদা। থিয়েটার রোড পেরিয়ে গেল। আগের দিনের মতো অফিসে নামলেন না দীপকাকু। স্নান-খাওয়া করে আবার নাকি বেরোবেন। ভালই হল ঝিনুকের, মাকে একা ফেস করতে হবে না।

গাড়িতে যেতে-যেতে ঝিনুকের মাথায় একটা প্রশ্ন খোঁচা মারতে থাকে। দীপকাকুকে জিজ্ঞেস করে, "ঘর তছনছের সঙ্গে রঘুর কি কোনও সম্পর্ক ছিল?"

"অবশ্যই ছিল।" বলেন দীপকাকু।

"কী করে? রঘু তো তখন বাইরে, অপরাজিতা দেবীর সঙ্গে।"

দীপকাকু বলেন, "রঘু আগেই ও বাড়ির চাবি ডুপ্লিকেট করিয়ে রেখেছিল। সাবানে ছাপ নিয়ে অথবা অন্য কোনওভাবে। সারাদিন ও বাড়ি থাকার সুবাদে যা ওর পক্ষে করা অত্যন্ত সহজ। তারপর সেই ডুপ্লিকেট চাবি তুলে দেয় দুষ্কৃতীর হাতে। এরকম একটা আশঙ্কার কথা আমার মাথায় আগেই এসেছিল। কিন্তু সেটা যে রঘুই করেছে সেটা আন্দাজ করতে পারিনি।"

চিন্তান্বিত মুখে ঝিনুক জানতে চায়, "আর একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, আপনি কেন রঘুর ব্যাপারটা ওদের বাড়িতে জানাতে দেরি করছেন?"

উত্তরে দীপকাকু বলেন, "আমি চাইছি সামনের কয়েক ঘণ্টায় আরও কিছু ঘটুক। সেই ক্লু নিয়ে আমাকে এগোতে হবে। তুমি বাড়ি গিয়ে প্রথমেই শ্রবণার মোবাইলে একটা ফোন করবে।"

"সে তো আপনার মোবাইল থেকেও করতে পারি।" বলে ঝিনুক।

"না। আমার মোবাইল থেকে নয়। নম্বরটা দেখে বুঝে যাবে তুমি আমার সঙ্গেই আছ। আমি সেটা চাইছি না। তুমি যেন এমনিই ফোন করেছ ভাব করবে।"

"ফোন করে কী বলব?" জানতে চায় ঝিনুক।

দীপকাকু বলেন, "তোমাকে কিছু বলতে হবে না। ওই বলতে শুরু করবে। শ্রবণা এখন দিদার বাড়িতেই আছে।"

"কী করে বুঝলেন?"

"অনুমান। রঘু ফিরছে না দেখে, ওরা অনেকবার আমার মোবাইলে ট্রাই করেছে। সুইচ অফ করে রেখেছি আমি। ব্যস্ততা দেখে বুঝতে অসুবিধে হয়নি অপরাজিতা দেবী ইতিমধ্যেই সব মেয়েদের বাড়িতে ডেকেছেন। একজন সকালেই এসেছিল। আর শ্রবণারা তো সব সময় ওঁর পাশে থাকছে।" বলে থামলেন দীপকাকু।

ঝিনুক বলে, "শ্রবণা নিশ্চয়ই প্রথমে 'রঘু বেপাত্তা' খবরটা দেবে। তারপর যখন জানতে চাইবে, আপনি কোথায়, কনট্যাক্ট করা যাচ্ছে না কেন, তখন কী বলব?"

"বলবে, তুমি কিছু জানো না। তার সঙ্গে আমাকে খুঁজে বের করার আশ্বাস দেবে। তারপর কথায়-কথায় ওদের বাড়ির পরিস্থিতি জানবে। কে কে এসেছেন, আসেননি। মেসোমশাইরা কোথায়, সবকিছু।"

ঝিনুক অবাক কণ্ঠে বলে, "আপনি কি এখনও অপরাজিতা দেবীর মেয়েদের উপর থেকে সন্দেহটা সরাতে পারছেন না? রঘুর ঘটনায় তো বোঝাই গেল, বাইরের কেউ এসব করাচ্ছে।"

"সে কতটা বাইরের, এ ব্যাপারে আমার ধন্ধ এখনও কাটেনি। এমন কিছু ক্লু ও বাড়ি থেকে আমি পেয়েছি, যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কথায় কথায় ঝিনুকদের গেটে পৌঁছে গেল গাড়ি। ঝিনুকের টেনশন শুরু হয়। যথেষ্ট বেলা হয়েছে। কে জানে, মায়ের মুড কেমন।

গেট পেরিয়ে মেন দরজার বেল বাজাতে খুললেন মা। নাঃ, চেহারায় কোনও দুশ্চিন্তার ছাপ নেই। বরং উৎফুল্ল হয়ে জানতে চাইলেন, "কী রে, অ্যাডমিশন হল?"

ঝিনুক ধরতে পারে না, কিসের অ্যাডমিশন। বাবা নির্ঘাত কিছু

ভুলভাল বুঝিয়ে রেখেছে। কিন্তু সেটা ঝিনুককে জানিয়ে রাখবে তো। দীপকাকু সামাল দেন, "হ্যাঁ, বউদি, অ্যাডমিশন হয়ে গেছে। কিন্তু যা টাফ কোর্স! তার উপর অতদূর যাওয়া, পারবে?"

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে দীপকাকু আন্দাজে ম্যানেজ দিচ্ছেন, বাবা দীপকাকুকেও কিছু বলার সুযোগ পাননি।

মা বলেন, "ও ঠিক পারবে। আমার মেয়ে যথেষ্ট পরিশ্রমী। তা ছাড়া আমার অনেকদিনের ইচ্ছে..."

কথা থেমে গিয়ে মায়ের দৃষ্টি এখন ঝিনুকের কনুইয়ের উপর স্থির। চোখ ক্রমশ বড় হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অটোমেটিক্যালি দু'চোখ বেয়ে জল গড়াতে শুরু করল।

দীপকাকু অপ্রস্তুত। কী বলবেন ভেবে না পেয়ে চটজলদি বলে ফেলেন, "ও কিছু না, বাস থেকে নামতে গিয়ে পা স্লিপ করে রাস্তায় পড়ে গেছে। আমি রিস্ক নিইনি, তক্ষুণি ওষুধের দোকানে গিয়ে টেটভ্যাক ইঞ্জেকশন দিইয়ে ড্রেস করিয়ে নিয়েছি। আপনি চিন্তা করবেন না। সামান্য ইনজুরি।"

মায়ের চিন্তা করার শক্তি নেই। সোফায় শরীরটা ছেড়ে দেন। অথচ একটু মাথা খাটালেই দীপকাকুর মিথ্যেটা ধরা পড়ে যেত। ঝিনুকরা বেরোল গাড়ি নিয়ে, দীপকাকু বলছেন, বাস থেকে পড়ে গেছে। সিলি মিসটেক। যে কোনও গোয়েন্দার এটা ক্ষমার অযোগ্য ভুল। আসলে বড়-বড় চিন্তায় দীপকাকু এতই ব্যস্ত, ছোটখাটো ব্যাপার খেয়ালই করছেন না।

ঝিনুক মায়ের পাশে গিয়ে বসে। পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বলে, "কিছু হয়নি মা, সামান্য একটু কেটেছড়ে গেছে। ব্যান্ডেজ বাঁধা দেখে তুমি ঘাবড়ে যাচ্ছ।"

কান্নাভেজা গলায় মা বলেন, "তোর বাবা বলল, তুই নাকি হঠাৎ ঠিক করেছিস গান শিখবি। ভর্তি হবি শ্যামবাজারের সুরবিতানে। দীপঙ্করের চেনা-জানা আছে, ওই নিয়ে গেছে ভর্তি করাতে। তারপর থেকে ঠাকুরকে ডাকছি, ভালয়-ভালয় যেন অ্যাডমিশন হয়ে যায়। আমার অনেকদিনের শখ তুই গান শিখিস, এত সুন্দর গানের গলা তোর। কিন্তু প্রথম দিনই এসব কী বাধালি!"

কথা অন্য খাতে বইয়ে দেওয়ার জন্যই দীপকাকু বলে ওঠেন, "আচ্ছা বউদি, রজতদা সার্ভিস পিরিয়ডে ওরকম একটা ঝুঁকির কাজ করতেন, প্লেন থেকে প্যারাসুট পিঠে নিয়ে ঝাঁপ দিতেন মাটিতে, তখন কীভাবে মানিয়ে নিতেন আপনি?

ঝিনুকের অনেকবার শোনা কথাটা মা আবার বলতে শুরু করেন, "মিলিটারিতে ওর কাজটা ঠিক কী, প্রথম দিকে বুঝতাম না আমি। আমাকে বলত, যুদ্ধে যেতে হয় না। খরা, বন্যা, ভূমিকম্প হলে উদ্ধারকার্যে নামতে হয়। পরে অবশ্য সবই জেনেছিলাম। তাই ছুটিতে এলেই বায়না জুড়তাম, চাকরিটা ছাড়ো। ভাগ্যিস মিলিটারি সার্ভিস বেশিদিনের হয় না। এক্সটেনশন পেয়েছিল, আমি নিতে দিইনি। চাকরি শেষ করে যদি বা ওর বাবা বাড়িতে থিতু হল, মেয়ের দস্যিপনা দিন দিন বাড়ছে..."

আরও হয়তো কিছু বলতেন মা। ফোন বেজে ওঠে। মা বলেন, "ধর। বোধহয় শ্রবণা করেছে। এর আগেও দু'বার করেছিল। আমি দীপঙ্করের জন্য চা করি। তুইও কি খাবি?"

মায়ের কথার উত্তর না দিয়ে ঝিনুক ফোন ধরতে ওঠে। মা রান্নাঘরে চলে যান।

"হ্যাঁ, বল।" ফোনের এ পাশ থেকে বলে ঝিনুক।

ঝিনুকের আন্দাজ নস্যাৎ করে ও পারে বাজখাঁই পুরুষকণ্ঠ বলে ওঠে, "তোমার গোয়েন্দাকাকাকে দাও।"

থতমত ভাব কাটিয়ে ঝিনুক জানতে চায়, "কে আপনি?"

"এত সহজেই বলে দেব? দাও, ফোনটা কাকাকে দাও।"

দীপকাকু উঠে এসেছেন। ইশারায় জানতে চান, "কার ফোন?"

ঝিনুক কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঠোঁট ওলটায়। ঝিনুকের হাত থেকে রিসিভার নেন দীপকাকু। কানে ঠেকিয়ে 'হ্যালো' বলেন। তারপর শুধু ও প্রান্তই কথা বলে যায়। দীপকাকু রা কাড়েন না। মুখ থমথমে হয়ে ওঠে। একটু পরে রিসিভার নামিয়ে রাখেন।

ভীষণ উদ্বেগে ঝিনুক জানতে চায়, "কে ছিল ফোনে?"

মাথা নাড়েন দীপকাকু। চিন্তিত মুখে বলেন, "বুঝতে পারছি না।"

"কী বলল?"

"যা হয়। হুমকি দিল। বলল, টিকটিকি মশাই, লাইনে তো নতুন। অপরাজিতা দেবীর কেসটায় বেশি এগিও না। শেষ হয়ে যাবে।"

"আপনি কিছু বললেন না!" উষ্মা প্রকাশ করে ঝিনুক।

দীপকাকু বলেন, "ফোনে ঝগড়া মানে তো ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করা। আমি চুপ থেকে ওর গলাটা চেনার চেষ্টা করছিলাম। এই কেসটার সূত্রে যাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ কিনা।"

"কিছু আন্দাজ করতে পারলেন?" জানতে চায় ঝিনুক।

সোফায় গিয়ে বসেন দীপকাকু। অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলেন, "সম্ভবত স্বর পালটে কথা বলছিল।"

মুখোমুখি বসে ঝিনুক বলে, "রঘু যাকে ফোন করেছিল, সেই লোকটা নয়তো? গলাটা তো আপনি শুনেছিলেন।"

"হতেও পারে। তবে এ গলাটা একদম অন্যরকম। ফোনে রুমাল চাপা দিয়ে কথা বলছিল হয়তো। আমার মোবাইলে ফোন করলে নম্বরটা জানা যেত। করল ল্যান্ড ফোনে। তবে এটা প্রমাণ হয়ে গেল, অপরাধী কাছাকাছির মধ্যেই আছে। আমাদের গতিবিধির উপরেও লক্ষ আছে তার। এমনকী এ বাড়ির ফোন নম্বরও জোগাড় করেছে।" বলে, গুম মেরে গেলেন দীপকাকু। খানিক পরে বলেন, "ওঠো, শ্রবণাকে ফোন করে নাও।"

তখনই চা হাতে ঘরে ঢোকেন মা। বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চান, "সে কী রে, এই তো শ্রবণা ফোন করল। আবার ফোন করতে হবে কেন?"

"আগেরটা ফল্‌স কল ছিল মা।" বলে আবার ফোন করতে যায় ঝিনুক। মা দীপকাকুর সঙ্গে সম্ভবত গানের স্কুলে অ্যাডমিশন নিয়ে কথা বলছেন। আরও একগাদা মিথ্যে কথা বলতে হবে দীপকাকুকে। ঝিনুকের সে সব কথায় কান নেই। ও পারে শ্রবণার মোবাইলে রিং হচ্ছে। দীপকাকুর অনুমান ঠিক হলে, দিদার বাড়িতেই থাকার কথা শ্রবণার।

ফোন কানে তুলল শ্রবণা, "হ্যাঁ রে, তোরা কী রে, সেই থেকে তোর বাড়িতে ফোন করছি, তোর কাকার মোবাইলও দেখছি অফ। কাকিমা বললেন, তুই নাকি গানের স্কুলে অ্যাডমিশন নিতে গেছিস।"

"হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছিস। এখন বল, ফোন করছিলি কেন?" জানতে চায় ঝিনুক।

শ্রবণা বলে, "তোর দীপকাকু এখন কোথায় রে?"

দীপকাকুর নির্দেশ মাথায় রেখে ঝিনুক বলে, "এইমাত্র আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।"

"তাঁর সঙ্গে ইমিডিয়েট কনট্যাক্ট করা যায় কীভাবে? উনি মোবাইল সেটটা অফ করে রাখেন কেন!" একটু যেন বিরক্তির সুরে বলে শ্রবণা।

ঝিনুক বলে, "কী হয়েছে আমাকে বল। দেখছি, যোগাযোগ করা যায় কিনা।"

"আবার একটা চিঠি এসেছে।"

"তাই নাকি!" বেশ জোরেই বলে ওঠে ঝিনুক। তারপরে জানতে চায়, "তুই এখন কোথায়?"

"দিদার বাড়ি। চিঠি পেয়েই দিদা ডেকে পাঠিয়েছে।"

"কী লেখা আছে চিঠিতে?"

ও পার থেকে শ্রবণা বলে, "আগের মতোই হুমকি। এবার আর একটা জিনিস অ্যাড হয়েছে, আমরা যে গোয়েন্দা লাগিয়েছি, জানতে পেরেছে কোনওভাবে।"

শেষ কথাটা অবশ্য ঝিনুকের কাছে অপ্রত্যাশিত নয়, আগের ফোনেই সে সেটা জানতে পেরেছে। যেটা জানা দরকার, জিজ্ঞেস

করে, "এবারের চিঠিতে কী লেখা আছে?"

শ্রবণা বলে, "এসব চিঠি কি ফোনে শুনে সমাধান করা যায়! তোরা কখন আসছিস?"

"আসছি। দীপকাকুর সঙ্গে যোগাযোগ করি। তুই চিঠির বয়ানটা বল।" ঝিনুকের গলায় উৎকণ্ঠা।

শ্রবণা একটু সময় নেয়। সম্ভবত চিঠিটা কারও থেকে নিল। তারপর বলে, "শোন, লিখেছে, 'মিছিমিছি দেরি করছেন ম্যাডাম। মৃত্যু কিন্তু এগিয়ে আসছে। আর মাত্র দু'দিন। গোয়েন্দার পিছনে অযথা টাকা ঢালছেন। নীল শাড়ি পরে বারান্দায় দাঁড়ান'।"

সাদা পাতায় কালো অক্ষরগুলো কী ভয়ঙ্কর বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছে, ফোনের এ প্রান্ত থেকেই তা টের পায় ঝিনুক। গলাটা একটু শুকনো-শুকনো লাগে। গলা ঝেড়ে নিয়ে বলে, "ঠিক আছে, তুই এখন রাখ। দেখছি কত তাড়াতাড়ি দীপকাকুকে নিয়ে তোদের ওখানে যাওয়া যায়।"

ফোন রেখে সোফায় ফিরে আসে ঝিনুক। মা ঘরে নেই। দীপকাকু সোফায় বসে চা খাচ্ছেন। ঝিনুকের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখ দেখে জানতে চান, "কী বলল?"

ঝিনুক পুরোটাই বলে। দীপকাকুর কপালে ভাঁজ বাড়ে একটার পর একটা। ঝিনুকের বলা শেষ হলে ভাঁজগুলো মিলিয়ে যায়। তারপর বলেন, "আমি বলেছিলাম না, আরও কিছু ঘটনা ঘটবে? তবে চিঠির ব্যাপারটা আশা করিনি। আর একটা জিনিস তুমি ওদের জানাতে ভুলে গেলে।"

তৎক্ষণাৎ কথাটা ঝিনুকের মনে পড়ে যায়। বলে ওঠে, "ওঃ হো, রঘুর কথাটাই বলা হল না। করব আর একবার?"

দীপকাকু বলেন, "না। এখন থাক। আমাদের নিয়েও ওঁরা যথেষ্ট ধন্ধে পড়ে যাবেন। এক্ষুনি বললে, গানের স্কুলে গিয়েছিলে, পরের ফোনে অন্য গল্প — তার চেয়ে ঘণ্টাখানেক ভেবে নিই। একসময় আমিই ফোন করে নেব।"

কথা শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছেন দীপকাকু। ঝিনুক বলে, "তা হলে চিঠিটা কখন দেখতে যাওয়া হবে?"

"যাব। চিঠি তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।" বলে দরজার দিকে পা বাড়ান দীপকাকু।

অধীর কণ্ঠে ঝিনুক বলে, "আমরা বোধহয় সময় বেশি নিয়ে ফেলছি। কেসটা ঘুরেফিরে একই জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে আছে।"

কথাটাকে গ্রাহ্য না করে দীপকাকু বলেন, "রজতদাকে বোলো, সন্ধেবেলা দাবা খেলতে আসব। জমিয়ে দু'চার দান খেললে, মাথাটা কাজ করে ভাল।"

দীপকাকু চলে যাওয়ার পর, দোলায়িত পরদার দিকে তাকিয়ে থাকে ঝিনুক, এই লোকটিও কম রহস্যজনক নন। এরকম গভীর সংকটজনক অবস্থাতেও দাবা খেলার ইচ্ছেটা রয়ে গেছে!

সন্ধে প্রায় সাতটা। এখনও দীপকাকুর দেখা নেই। বাবা অফিস থেকে ফিরেছেন অনেকক্ষণ। ইতিমধ্যেই ও বাড়ির সমস্ত ঘটনা জানা হয়ে গেছে ঝিনুকের থেকে। কিন্তু সে জানায় বাবা সন্তুষ্ট নন। ঝিনুকের বর্ণনায় অজস্র কোয়েশ্চেন মার্ক। বাবা একসময় বলেন, "তোকে না নিয়েই দীপঙ্কর হয়তো তদন্ত চালাচ্ছে। নইলে এতক্ষণে এসে যেত।"

উত্তরে ঝিনুক বলেছে, "আমাকে না নিলে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে কেস সল্‌ভ করতে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য এখন আমার কাছে।"

"কী ইনফর্মেশন? আমাকে বুঝি বলিসনি!"

মাথা নেড়ে ঝিনুক বলে, "এটা তোমাকে বলে কোনও লাভ নেই। তুমি তো কেসটা হ্যান্ডল করছ না।"

"তা হলে তোর দীপকাকুকেই আসতে দে।" বলে, টিভি-র খবরে মনোনিবেশ করেন বাবা।

তথ্যটা আজ দুপুরেই পেয়েছে ঝিনুক। দীপকাকু মানা করে গেলেও, ঝিনুক দুপুরে খেয়েদেয়ে উঠে শ্রবণাকে ফোন করে। বলে, "দীপকাকুর সঙ্গে এখনও কনট্যাক্ট করা যায়নি। তোর দিদার বাড়ির পরিস্থিতি কীরকম, আর কিছু ঘটেছে?"

শ্রবণা বলে, "এমনি সব ঠিকই আছে। নতুন কিছু ঘটেনি। আমরা তোদের অপেক্ষায় আছি।"

আসলে যেটা জানার, শ্রবণা কিছুতেই বলছে না দেখে, ঝিনুক সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করেছিল, "বাড়ির কাজের লোকেদের কী খবর?"

শ্রবণা সরল মনের মেয়ে। প্রশ্নটাকে সন্দেহ না করেই বলে ফেলে, "আর বলিস না, আজ আবার রঘুদা দেশে চলে গেল।"

"সে কী, কেন?" প্রায় আঁতকে উঠে জানতে চেয়েছিল ঝিনুক।

শ্রবণা বলে, "খবর এসেছে, ওর বাবার নাকি খুব শরীর খারাপ।"

হতাশকণ্ঠে ঝিনুক মনে করিয়ে দেয়, "দীপকাকু যে তোদের বলেছিল, কাজের লোকেদের এখন ছুটিছাটা না দিতে?"

ও প্রান্তে শ্রবণা বলে, "বাবার শরীর খারাপ বললে দিদা আর কী বলবে। ছেড়ে দিতেই হল।"

"ওর জিনিসপত্তর সব নিয়ে গেছে?" জানতে চেয়েছিল ঝিনুক।

উত্তরে শ্রবণা বলে, "ওদের আর জিনিস কী বল, একটা ব্যাগেই সব ধরে যায়।"

শ্রবণাকে সামান্য চমকে দিতে ঝিনুক বলেছিল, "রঘু চলে যাওয়ার সময় একটু খোঁড়াচ্ছিল, না রে?"

শ্রবণা যে কতটা অবাক হয়েছে, ফোনে ওর চেঁচানি শুনেই বোঝা যাচ্ছিল, "এই, তুই কী করে জানলি রে? সত্যিই খোঁড়াচ্ছিল রঘুদা। গা, হাত-পা দু'এক জায়গায় ছড়ে গেছে। বলছিল কোন গাড়ি নাকি গা ঘেঁষে ধাক্কা মেরেছে, মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। বাবার শরীর খারাপের চিন্তায় অন্যমনস্ক ছিল হয়তো। কিন্তু এসব তো তোর জানার কথা নয়!"

ঝিনুক গম্ভীরভাবে বলেছিল, "দেখা হলে সব বলব।"

তারপরই ঝিনুক ফোন করে দীপকাকুর বাড়িতে। ফোন তুলল কাজের মাসি। এই মাসিই দীপকাকুর দেখাশোনা করে। দীপকাকুর মা, বাবা থাকেন মেদিনীপুরে দেশের বাড়িতে। মাসি বোধহয় কানে কম শোনে। দীপকাকুকে চাইছে, বোঝাতে বেশ সময় লেগেছিল ঝিনুকের। বোঝার পর মাসি বলে, "তিনি এখন ঘুমোচ্ছেন। ডাকা মানা।"

ঝিনুক তো অবাক, বলে গেল ঘণ্টাখানেক ধরে ভাববে, তার বদলে ঘুমোচ্ছে। এ কী রে বাবা! বিকেলে আবার বাড়িতে ট্রাই করেছিল ঝিনুক। মাসি বলল, বেরিয়ে গেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে মোবাইলে ফোন করে ঝিনুক, যথারীতি সুইচ অফ। তারপর থেকে আর স্বস্তি পাচ্ছে না ঝিনুক। মাঝে-মধ্যেই মাথায় ঘুরেফিরে আসছে রঘুর কথা। ব্যাটার কী সাহস, ওই অবস্থায় ও বাড়ি ঢুকে নিজের জিনিস গুছিয়ে হাওয়া। ইস, তখন যদি দীপকাকু আমার কথা শুনে ও বাড়িতে একটা ফোন করে দিতেন, কখন ধরা পড়ে যেত রঘু...

ঝিনুকের ভাবনার মাঝেই ডোরবেল বেজে ওঠে। নিজের স্টাডি থেকে ছিটকে ড্রয়িং-এ আসে ঝিনুক। বাবা দরজা খুলছেন।

খুবই ঢিলেঢালা ভঙ্গিতে ঘরে ঢোকেন দীপকাকু। যেমন অন্যদিন আসেন দাবা খেলতে। নতুনের মধ্যে আজ শুধু হাতে একটা ডায়েরি। দরজার পাশে কাবলি জুতো ছেড়ে ঝিনুকের দিকে তাকালেন। ঝিনুকের দৃষ্টিতে একগাদা কথা জমে আছে। মিটিমিটি হেসে দীপকাকু বলেন, "রঘুবীর না বীররঘু, কী উপাধি দেবে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে?"

দীপকাকুর কথা শুনে ঝিনুক বুঝতে পারে রঘুর ব্যাপারটা জেনে গেছেন। নিজের অসতর্কতা ঢাকার জন্য কটাক্ষ করছেন ঝিনুককে। ঝিনুক তবু দৌড়ে প্রায় ধরে ফেলেছিল রঘুকে। উনি তো রঘুর যেন কোনও ক্ষতি না হয়, সেভাবে পালিয়ে যেতে সাহায্য করলেন।

দীপকাকুর উপস্থিতিতে বাবার মুখে খুশির আমেজ।

সেন্টার টেবিলে দাবার বোর্ড পেতে বাবা বলেন, "এখন কিন্তু শুধু

তোমাদের তদন্ত নিয়ে কথা চলবে না। সঙ্গে খেলাও থাকবে।"

দীপকাকু বাবার মুখোমুখি সোফায় গিয়ে বসেন। ডায়েরিটা রাখেন টেবিলের উপর। বড়সড়, বেশ অভিজাত দেখতে ডায়েরিটা। নিশ্চিন্তে দীপকাকুকে ঘুঁটি সাজাতে দেখে ঝিনুক আর ধৈর্য রাখতে পারে না। কাছে গিয়ে বলে, "রঘুর ব্যাপারটা কখন জানলেন?"

"কিছুক্ষণ আগে। ওদের বাড়িতে ফোন করেছিলাম।" বলে চুপ করে গেলেন দীপকাকু।

ঝিনুক বলে, "ওরা কিন্তু খুব টেনশনে আছে। অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।"

"জানি। ফোনে বলেছে। বলেছি, কাল দুপুরে যাব।" কেটে-কেটে জবাব দেন দীপকাকু। উত্তর দেওয়ার যেন কোনও ইচ্ছেই নেই।

ঝিনুকও ছাড়বার পাত্রী নয়। বলে, "হাতে মাত্র দু'দিন সময়। একজন অপরাধীকে যদি বা চিহ্নিত করা গেল, আমাদের ভুলে সেও হাতের বাইরে। এত অল্প সময়ের মধ্যে আপনি পারবেন রহস্যের কিনারা করতে? আর সত্যিই যদি অপরাজিতা দেবীর কিছু হয়ে যায়, কী জবাব দেব আমরা।"

এবার যেন একটু সিরিয়াস দেখায় দীপকাকুকে। বাবার দানের উত্তরে দান দিয়ে বলেন, "রঘু যে আবার ও বাড়ি ফিরে যাবে, এটা আমি এতটুকু আন্দাজ করতে পারিনি। সাধারণ বুদ্ধির কোনও অপরাধীই এই কাজ করবে না। সে ধরেই নেবে আমরা ফোন করে ও বাড়িতে জানিয়ে দেব। রঘু বোকা নয়। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, রঘু জানত, আমরা ফোন করে যাই বলি, অপরাজিতা দেবী ওকে আটকাবেন না। অর্থাৎ অপরাজিতা দেবীর কোনও এক দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে রঘু। কী সেই দুর্বলতা?"

খুবই সূক্ষ্ম ও ন্যায্য প্রশ্ন। ঝিনুক এইভাবে ভেবে দেখেনি।

দীপকাকু আবার বলেন, "রঘুর ব্যাপারটাই আমার তদন্তের শৃঙ্খলাটা একটু ভেঙে দিল, নয়তো ঠিকই এগোচ্ছিলাম।"

"তুমি আপাতত দানটা দাও।" বাবা তাড়া দেন। খেলার দিকে দীপকাকুর আর মন নেই। চাল না দিয়ে গভীরভাবে কী যেন ভেবে যাচ্ছেন।

অদম্য কৌতূহলে ঝিনুক জানতে চায়, "কতদূর এগিয়েছিলেন?"

"অনেকটা। বিকেলে গিয়েছিলাম তালতলা থানায়। রঞ্জনের বন্ধু ওসি পার্থ মজুমদার খুব হেল্প করল।"

"থানায় যাওয়ার কারণ?" জানতে চায় ঝিনুক।

দীপকাকু বলেন, "অপরাজিতা দেবীর ভাড়াটে সত্যবান মিত্রর আত্মহত্যা এবং তাঁর দুই ছেলের বাবার সম্পত্তির উপর অনীহা আমাকে কিছুটা অবাক করেছিল। সত্যবান মিত্রর ফ্ল্যাটটা ভালভাবে লক্ষ করতে গিয়ে আমার চোখে এমন কিছু পড়েছে, যার সঙ্গে অপরাজিতা দেবীর কেসের সামান্য হলেও যোগসূত্র আছে।"

"কী সেটা?" জানতে চেয়ে সোফার পাশে ছোট টুলটায় বসে ঝিনুক।

দীপকাকু বলেন, "এক্ষুনি সেটা বলছি না। থানায় গিয়ে যা জানলাম সেটা আগে শোনো", বলে একটু থামলেন। সম্ভবত কথাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছেন। বাবাও ক্রমশ মনোযোগী হয়ে পড়ছেন ঝিনুকদের আলোচনায়।

দীপকাকু বলতে শুরু করেন, "অপরাজিতা দেবীর বাড়িটা তালতলা থানার আন্ডারে পড়ে বলে সত্যবান মিত্রর আত্মহত্যার এনকোয়ারি করতে এসেছিল পার্থ। ইয়াং এনার্জেটিক সৎ পুলিশ অফিসার। খুবই বিশ্বস্ত ভাবে কেসটা ইনভেস্টিগেট করেছে সে। প্রমাণিত হয়েছে মৃত্যুটি হত্যা নয়, আত্মহত্যাই। সত্যবানবাবুর সম্বন্ধে তথ্য হচ্ছে, উনি একজন ভাষাবিদ। দিল্লিতে ভাষাতত্ত্ব পড়াতেন। ভদ্রলোক চাকরিজীবনেই স্ত্রীকে হারিয়েছেন। ওঁর দুটি পুত্রসন্তান, দুজনেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। রিটায়ারমেন্টের পর সত্যবান মিত্র সঞ্চিত অর্থ নিয়ে মিশরে যান। ভারতীয় ভাষায় আরবি ভাষার প্রভাব নিয়ে গবেষণা করছিলেন তিনি। আরবি ভাষার প্রকৃত রূপ জানার জন্যই তাঁর মিশর যাত্রা। আলেকজান্দ্রিয়া ইউনিভার্সিটির যথেষ্ট সাহায্যও তিনি পাচ্ছিলেন। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তিনি হঠাৎ সব কিছু ছেড়ে দিল্লি নয়, কলকাতায় চলে আসেন। ছোটছেলে দিল্লিতে সেটল্‌ড। ইঞ্জিনিয়ার। বড়ছেলে কয়েক বছর হল কলকাতায় এসে ব্যবসা করছে। অ্যাড এজেন্সি আছে তার। সত্যবান মিত্র কোনও ছেলের কাছেই এসে ওঠেননি। একলা বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন। স্বাভাবিক কারণেই এই আচরণ ছেলেদের পছন্দ হয়নি। তারপর থেকেই বাবার ব্যাপারে তারা আগ্রহ হারায়। এর আর একটা কারণও আছে, ভদ্রলোক তেমন কিছু বিষয়-সম্পত্তি রেখে যেতে পারেননি।" এতদূর বলে দীপকাকু একটু থামেন।

এখন পর্যন্ত সত্যবান মিত্রর সঙ্গে ও বাড়ির বিপদের কী সম্পর্ক, বের করতে পারেনি ঝিনুক। তবে সত্যবান মিত্রর ব্যাপারটাও কম ইন্টারেস্টিং নয়। যদিও কোথাও কিছু অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। সেটাই দীপকাকুকে বলে ঝিনুক, "সত্যবান মিত্র যে একলা থাকতে চেয়েছেন, এটা তো অপরাধ নয়। উনি তো সে অর্থে ছেলেদের কোনও বঞ্চনা করেননি। তা হলে ছেলেদের কিসের এত রাগ?"

দীপকাকু বলেন, "এই জায়গাটা আমার কাছেও ধোঁয়াশার মতো। মনে হচ্ছে এর পিছনে আরও কোনও কারণ লুকিয়ে আছে। বিশেষ করে সত্যবান যখন আত্মহত্যা করেন, শারীরিক, মানসিক দু'ভাবেই যথেষ্ট বিপর্যস্ত ছিলেন। বেশ কিছুদিন অন্তর হলেও, বড়ছেলে বাবাকে দেখতে আসত। বাবার শরীরের অবস্থা তার কাছে অজানা ছিল না। জোর করে নিজের কাছে নিয়ে যেতে পারত বাবাকে। অথবা ভদ্রলোক খুবই জেদি প্রকৃতির ছিলেন। লো প্রেশার, ক্ষীণ স্বাস্থ্য, তার উপর নিয়মিত মদ্যপান। শেষ দিকে তাঁর মাথাটাও ঠিকমতো কাজ করছিল না। তারই কিছু প্রমাণ এই ডায়েরিতে পাওয়া যাবে।"

টেবিলের উপর থেকে ডায়েরিটা তুলে নিলেন দীপকাকু। অর্থাৎ মৃতের ডায়েরি। বুকটা ছমছম করে ওঠে ঝিনুকের। ডায়েরির পাতা ওলটাতে-ওলটাতে দীপকাকু বলেন, "ওসি পার্থ মজুমদার এই ডায়েরিটা সংগ্রহ করে সত্যবান মিত্রর ফ্ল্যাট তদন্ত করতে গিয়ে। আরও দু'-চারটে জিনিস যা আত্মহত্যাকে প্রমাণ করে, সেগুলো ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দিলেও, ডায়েরিটা রাখে নিজের কাছে।

"কারণ?" এটা জানতে চান বাবা।

দীপকাকু বলেন, "ডায়েরিতে এমন কিছু লেখা আছে, যা খুব এলোমেলো অথচ আকর্ষক। এবং সত্যবান মিত্রর কেসে ডায়েরিটা একটা কথাই বলে, ভদ্রলোক শেষ বয়সে সম্ভবত পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।"

আবার থেমে যান দীপকাকু। ঝিনুকের তর সইছে না, এক্ষুনি ডায়েরির লেখাগুলো পড়তে ইচ্ছে করছে। কিচেনের দিকে উঁকিঝুঁকি মেরে দীপকাকু বলেন, "কী ব্যাপার রজতদা, বউদি চা দিচ্ছেন না কেন? অনেকক্ষণ তো এসেছি!"

"তিনি পাশের বাড়ির মেয়ের বিয়ের মার্কেটিং দেখতে গেছেন।" বলেন বাবা।

দীপকাকু বলেন, "তা হলে ঝিনুক চা করুক।"

ঝিনুক বলে, "এই ব্যান্ডেজ-বাঁধা হাতে চা করা যায়।"

"খুব যায়। এমন কিছু লাগেনি।" বলেন দীপকাকু।

বাবা বাঁচিয়ে দেন, "ওর চা তুমি মুখে দিতে পারবে না। তার চেয়ে যা বলছিলে বলো।"

ঝিনুক মনে-মনে হাসে। চা সে মোটেই খারাপ করে না। আশা ছেড়ে দীপকাকু শুরু করলেন, "ডায়েরিটা পড়ার আগে ভদ্রলোক কীভাবে সুইসাইড করেছিলেন বলে নিই, মদের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে খেয়েছিলেন। লো প্রেশারের রুগির পক্ষে ওই ওষুধ মারাত্মক। ফরেনসিক থেকে জানা গেছে, ওই ট্যাবলেট মদ-জাতীয় তরলে মেশালে কোনও স্বাদ পরিবর্তন, মানে তিতকুটে লাগে না। ফলে বমি

হয়ে ওষুধটা উঠে যাওয়ার কোনও চান্স নেই। নিরবচ্ছিন্ন শান্তি নিয়ে চিরনিদ্রায় চলে যাওয়া যায়। পদ্ধতি দেখে বোঝাই যাচ্ছে আত্মহত্যার পরিকল্পনা উনি অনেকটা সময় নিয়েই করেছিলেন।"

"অন্য কেউ তো তাঁর ড্রিঙ্কে ওষুধটা মিশিয়ে দিতে পারে," বলে ঝিনুক।

"তা নিশ্চয়ই পারে। কিন্তু বোতলের গায়ে, গ্লাসে সত্যবানবাবু ছাড়া অন্য কারও হাতের ছাপ পাওয়া যায়নি। তবে মেঝেতে দুজন বাইরের মানুষের পায়ের ছাপ ছিল।"

বাবা সোজা হয়ে বসে বলেন, "কাদের পায়ের ছাপ সেগুলো?"

"সত্যবানের বড়ছেলে এবং তার এক ডাক্তার-বন্ধুর। বড়ছেলে নিজেই পুলিশকে বলেছে, সেদিন সন্ধেবেলা ডাক্তার-বন্ধু নিয়ে বাবার কাছে গিয়েছিল। বাবার শরীর ঢেক-আপ করানোই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। বাবা সেটাও তাকে করতে দেননি। ছেলে বেরিয়ে যায় সন্ধে সাতটা-সাড়ে সাতটা নাগাদ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী মৃত্যু হয় রাত সাড়ে আটটায়।"

আরও কী সব বলে যাচ্ছেন দীপকাকু। এই প্রথম ঝিনুক একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। তার মন পড়ে আছে ডায়েরির পাতায়। কী লেখা আছে সেখানে?

বেশ খানিকক্ষণ কথা বলার পর আঙুল ডুবিয়ে রাখা পাতাটা খোলেন দীপকাকু। ফাঁকা পাতায় দু-চার লাইন বাংলা অক্ষর লেখা। দীপকাকু বলেন, "ভদ্রলোক নিয়মিত ডায়েরি লিখতেন না। দিনপঞ্জী তো নয়ই। যখন যা মনে এসেছে, মন্তব্যের মতো দু-চার লাইন লিখে রেখেছেন। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রসঙ্গ বাদ দেওয়াই যায়। যেমন, একজায়গায় ফর্দ করে বাজারদর লেখা, তার নীচে পেঁয়াজের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা আছে। 'নিল নদের জোলো হাওয়ার সঙ্গে গঙ্গার হাওয়ার কোথায় পার্থক্য', তাও বর্ণনা করা আছে ডায়েরির এক পাতায়। আবার কিছু হাস্যকর মন্তব্যও লিখেছেন। যেমন, 'যে মানুষ চায়ে বিস্কুট ডুবিয়ে খায়, তার মনের গভীরতা কম', 'মোজা ছাড়া জুতো পরা মানুষ সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে', আর এক জায়গায় লেখা, 'স্যাকরাবাড়ির বেড়াল ঠুকঠুকুনিতে ভয় পায় না'— এই সব হিজিবিজি। কী মানে হয় এসবের! শুধু একটা বিশেষ প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে এসব লেখার মাঝে ঢুকে আছে, কোনও এক দুঃখী রানির কথা। ...এই যে এখানে লিখেছেন..." বলে পাতা উলটে পড়তে শুরু করেন দীপকাকু, "...'রানির কান্না নিল নদে মিশে যায়'... খানিকটা বাদ দিয়ে সম্ভবত অন্যদিন লেখা, 'আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের লাইটহাউসের আলো যেন রানির অস্থির অসহায় চোখ।'"

পাতা উলটে দীপকাকু বলেন, "এখানে লিখেছেন, 'রানির কান্না ধরা আছে আমার কাছে'। আর এক জায়গায় লেখা, 'ইতিহাসকে ফাঁকি দিতে পেরেছেন রানি, তস্করদের নয়।'" বেশ কিছু পাতা বাদ গিয়ে দীপকাকু বলেন, "দ্যাখো, এখানে লেখা আছে, 'রানির কান্না নিরাপদে রাখলাম। সত্যিই কি নিরাপদ?'" ডায়েরি বন্ধ করলেন দীপকাকু।

ঝিনুকের বুদ্ধিশুদ্ধি ঘেঁটে একসা। দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "কী বুঝলে?"

ঝিনুক মাথা নাড়ে। মানে কিছুই বোঝেনি। বাবা বলেন, "লোকটা বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। আর এই ডায়েরি নিয়ে পড়ে থাকলে, তোমাদের তদন্তের দফারফা হবে।"

দীপকাকু বলেন, "না। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ডায়েরির লেখাগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে আসল রহস্য। সেটা ভেদ করে উঠতে পারলেই অপরাজিতা দেবীর কেসটা সমাধান হয়ে যাবে।"

ভীষণ কৌতূহলে ঝিনুক বলে, "ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবেন?"

"এখন বলা ঠিক হবে না। কেননা সব কিছুই অনুমাননির্ভর। তবে এটুকু বলা যেতে পারে, ডায়েরির আপাত-অসংলগ্ন মন্তব্যগুলো আমাদের রহস্য উদ্‌ঘাটনের নির্দেশ দিচ্ছে।"

দীপকাকুর কথা শেষ হতেই বাবা বলে ওঠেন, "আমি একটা কথা বুঝে উঠতে পারছি না। ভদ্রলোক, মানে সত্যবান মিত্র, তোমাকে চিনতেন না, জানতেন না, খামকা তোমার কেরিয়ারের উন্নতির জন্য গুটিকয় ধাঁধা লিখে যাবেন কেন?"

বাবার কথা শুনে হেসে ফেলেন দীপকাকু। ঝিনুকও মজা পায়। দীপকাকু বলেন, "ঠিক ধাঁধা লিখব বলে লেখেননি সত্যবান। এসবই তাঁর আত্মকথন। একা থাকলে নিজের সঙ্গে কথা বলা ছাড়া উপায় থাকে না। আর স্পষ্ট করে না লেখার কারণ, মনের কথাগুলো গোপন রাখতে চেয়েছেন।"

দীপকাকুও তো কিছু কম হেঁয়ালি করছেন না। ঝিনুক অসহায়ভাবে বাবা আর দীপকাকুর দিকে তাকায়। বাবা চিন্তামগ্ন। দীপকাকু ডায়েরির পাতার দিকে চেয়ে বসে আছেন। ওইখানে লেখা আছে, আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর, রানির কান্না, নিল নদ ...সত্যিই কি ওর মধ্যে লুকিয়ে আছে রহস্যের আশু সমাধান? ঝিনুকের আশ্চর্য লাগে।

একটুক্ষণ পর দীর্ঘ একটা শ্বাস ছেড়ে বাবা বললেন, "দ্যাখো দীপঙ্কর, তোমার এই কেস সম্বন্ধে আমি যতটুকু ঝিনুকের মুখে শুনেছি এবং এতক্ষণ যা শুনলাম, তাতে আমার মনে হচ্ছে, রহস্যটি ভীষণ জটিল এবং বেশ উঁচুমানের। এর সমাধান যদি তুমি করে ফেলতে পারো, জানবে, এই কেসটাই হবে তোমার কেরিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট। আত্মবিশ্বাস তো বাড়বেই তোমার, তার সঙ্গে একজন সত্যিকারের গোয়েন্দা হিসেবে স্বীকৃতি পাবে তোমাদের মহলে।"

একটু বোধহয় আবেগতাড়িত হয়ে দীপকাকু বলে ফেলেন, "এসবই নির্ভর করছে আপনার আশীর্বাদ, শুভকামনার উপর।"

বাবাকে বেশ ভালই বোঝে ঝিনুক। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে কোনও প্যাঁচ কষছেন। ঝিনুকের অনুমানই ঠিক হয়। বাবা বলেন, "আমার শুভেচ্ছা সবসময় তোমার সঙ্গে আছে। তবে এই কেসটার তদন্তের তুমি উপযুক্ত কিনা, সেটার একটা পরীক্ষা নিতে চাই।"

"কীরকম বলুন?" জানতে চান দীপকাকু।

বাবা বলেন, "সত্যবানবাবুর সব লেখার মানে আমি জানতে চাইছি না। শুধু একটা লাইন আমার খুব চেনা লেগেছে, 'স্যাকরাবাড়ির বেড়াল ঠুকঠুকুনিতে ভয় পায় না', এর কী মানে করছ বলো?"

ফের মিটিমিটি হাসি ফিরে আসে দীপকাকুর মুখে। বলেন, "এটা একটা পুরনো প্রবাদ। আপনি হয়তো ছেলেবেলায় শুনেছিলেন।"

"ঠিক তাই। কিন্তু এ কথা উনি হঠাৎ লিখলেন কেন?" জানতে চান বাবা।

দীপকাকু বলেন, "সম্ভবত ভদ্রলোককে মৃদু ভয় অথবা হুমকি দেওয়া হচ্ছিল, তারপরই উনি প্রবাদটি লেখেন।"

বিস্ময়ে চোখ বড়-বড় হয়ে গেছে ঝিনুকের। বাবারও একই অবস্থা। সত্যিই কী অসম্ভব অনুমানশক্তি দীপকাকুর!

হাসতে-হাসতেই দীপকাকু বলেন, রজতদা, আপনি যতই ওসকান, আর কিছু বলছি না। এই কেসটার জন্য আরও দু'একজনের সাক্ষাৎকার আমার প্রয়োজন, আর সামান্য কিছু ক্লু, আশা করছি আগামী দু'তিন দিনের মধ্যেই রহস্য সমাধান করে দেব।"

"তিন নয়, দু'দিন সময় দেওয়া আছে চিঠিতে।" খেয়াল করিয়ে দেয় ঝিনুক।

ডোরবেল বাজে। ঝিনুক উঠে গিয়ে দরজা খোলে। একমুখ হাসি নিয়ে মা ঢোকেন, "কী দারুণ বেনারসি হয়েছে পুতুলের, ওই রংটায় তোকেও খুব মানাবে, জানিস ঝিনুক!" বলে, দীপকাকুর দিকে চোখ যায় মায়ের। বলেন, "আরে দীপঙ্কর, কখন এলে! চা দিয়েছে ঝিনুক?"

"কই আর দিল। এদিকে আপনার হাতে চা, ভাজাটাজা না খেয়ে উঠতেও পারছি না।"

দীপকাকুর কথার পিঠে মায়ের উদ্দেশে বাবা বলেন, "এতদিন তো দীপঙ্কর তোমার হাতে খেয়ে গেল, এবার একদিন আমাদের চিনেপাড়ায় খাওয়াবে। অনেক টাকার একটা কেস প্রায় সল্‌ভ করে এনেছে।"

অবাক গলায় মা বলেন, "তাই নাকি দীপঙ্কর, কবে খাওয়াচ্ছ?"

দীপকাকু কিন্তু মোটেই অপ্রস্তুত হলেন না। বললেন, "দু'চার দিনের মধ্যেই। তবে তার আগে একটা ব্যাপারে আপনার ছোট্ট অনুমতি চাই।"

ভ্রু কুঁচকে মা জানতে চান, "কিসের পারমিশন?"

দীপকাকু বলেন, "আমার কেসটা সল্‌ভ হতে বড়জোর দিনতিনেক সময় লাগবে। এই ক'টা দিন আমার সহকারী হিসেবে ঝিনুককে একটু দরকার। এখন আপনি যদি অনুমতি দেন..."

মুহূর্তের মধ্যে মায়ের মুখ থেকে খুশি উধাও। বিষণ্ণগলায় বলেন, "মেয়ে হয়ে ও আর তোমাকে কী সাহায্য করবে বলো! এই তো দেখলে, সামান্য বাস থেকে নামতে গিয়ে হাত-পা কেটে এল।"

দীপকাকু আশ্বাস দিয়ে বলেন, "ওসব নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না, এবার থেকে আমি ভালমত খেয়াল রাখব। আসলে ওর মতো একটা সফ্‌ট লুকিং মেয়ে সঙ্গে থাকলে নিজের পরিচয় লুকোতে সুবিধে হয়।"

'সফ্‌ট লুকিং' প্রশংসাটা মোটেই ভাল লাগেনি ঝিনুকের। আপত্তি জানিয়েও লাভ নেই। দীপকাকু এখন যা বলছেন সবই তো ঝিনুকের পক্ষেই যাচ্ছে।

গভীর আশঙ্কায় মা জানতে চান, "তোমার এই কেসে গুলি-বন্দুকের ব্যাপার নেই তো?"

"না না, ওসবের কোনও প্রয়োজনই হবে না। তা ছাড়া পিস্তল ব্যবহার করার মতো কেস আমার কাছে আসতে যাবে কেন?"

দীপকাকুর নিরীহ চেহারা অথবা বোঝানোর গুণেই মা নিমরাজি হয়ে বললেন, "দ্যাখো, যা ভাল বোঝো। ওর বাবা নিশ্চয়ই অনেক আগেই রাজি হয়ে আছেন।"

মা কিচেনের দিকে চলে যেতেই ঝিনুক হাত ঝাঁকিয়ে 'ইয়া' বলতে যাবে, চোট পাওয়া কনুইটা চিনচিন করে উঠল। মনে পড়ল রঘুর চেহারা। ঝিনুক মনে-মনে বলে, ব্যাটাকে যদি আর একবার বাগে পাই, দেখে নেব।

## ॥ চার ॥

এই ক'দিনের জন্য বাবা গাড়িটা পুরোপুরি ঝিনুকদের ছেড়ে দিয়েছেন। আশুদা তাতে খুব একটা খুশি হয়নি। কেননা প্রথম দিনেই তাকে যে হারে ঘুরিয়ে যাচ্ছেন দীপকাকু, আশুদার মুখ ভার।

দীপকাকু গাড়ি থেকে নেমে যেখানেই যাচ্ছেন, ঝিনুক সঙ্গে থাকছে। প্রথমে ক্যামাক স্ট্রিটের একটা অ্যাড এজেন্সিতে, সেখান থেকে ক্রিক রো-র সেই টেলিফোন বুথে, যেখান থেকে রঘু পালিয়েছিল, তারপর তালতলা থানা! প্রত্যেকটা জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার পর আরও গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে দীপকাকুর মুখ। মহাত্মা গাঁধী রোড ধরে গাড়ি এখন ঠিক কোথায় যাচ্ছে, জিজ্ঞেস করতে ভরসা হচ্ছে না ঝিনুকের।

সকালে বাড়ি থেকে বেরনোর সময় ঝিনুকের মনে হয়েছিল, দীপকাকু বুঝি শ্রবণার দিদার বাড়িতে যাবেন। ওরা অপেক্ষায় আছে। এ ছাড়াও তৃতীয় চিঠিটা দেখার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল ঝিনুকের। দীপকাকুর সে ব্যাপারে কোনও আগ্রহ নেই। অপরাজিতা দেবীর বাড়ির কাছাকাছি টেলিফোন বুথে ঢুকে খানিকক্ষণ কাটালেও গাড়ি ঘুরিয়ে ফের তালতলা থানা।

আজ দীপকাকুর পোশাক অনেক পরিপাটি। গুঁজে শার্ট পরেছেন। পায়ে শু। কিন্তু সিঁথিকাটা হেয়ার স্টাইল আর বোতলের পিছন-ভাঙা কাচের চশমাটা ওঁকে কিছুতেই স্মার্ট হতে দিচ্ছে না। বেশ অন্যমনস্ক হয়ে আছেন। হাঁটা-চলায় অস্থির তড়িঘড়ি ভাব। চিঠিতে দেওয়া সময় কমে আসাটা নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তায় রেখেছে দীপকাকুকে। সকাল থেকে যে সব জায়গায় গেছেন, কোথাও বেশিক্ষণ সময় নেননি। ক্যামাক স্ট্রিটের অ্যাড এজেন্সিটা দীপকাকুর এক দূর সম্পর্কের মামার। সেখানে গিয়ে খোঁজ নিলেন, সত্যবান মিত্রর বড়ছেলে জয়ন্ত মিত্রর অ্যাড এজেন্সি 'মাইল স্টোন'-এর পরিচিতি কতটা? চলে কেমন? মামা বললেন, "জয়ন্ত মিত্র দিল্লি থেকে এসেছিল অনেক আশা নিয়ে। কলকাতায় তেমন সুবিধে করতে পারেনি।"

আরও কিছু দরকারি কথা সেরে দীপকাকু বেরিয়ে আসেন। তারপর ওঁর নির্দেশমত আশুদা গাড়ি নিয়ে যায় ক্রিক রো-র টেলিফোন বুথের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে দীপকাকু বুথমালিকের কাছে যান। বুথমালিক বয়স্ক মানুষ। চোখে-মুখে অনেক অভিজ্ঞতার ছাপ। দীপকাকুর কার্ড দেখে খুব একটা চমকালেন না। দীপকাকু রঘুর বর্ণনা দিয়ে বলেন, "ইদানীং সে ফোন করতে আসে কিনা?"

বুথমালিক বলেন, "ক'দিন দেখিনি।

দীপকাকুর পরের প্রশ্ন ছিল, "আপনি তো ডিসপ্লে বোর্ডের নম্বর দেখেই বুঝতে পারেন কাস্টমার কোন অঞ্চলে ফোন করছে। রঘু মোটামুটি কোথায়-কোথায় ফোন করত, কিছু বলতে পারবেন? বিশেষ কোনও নম্বরে বারবার ফোন করত কি?"

বুথমালিক গম্ভীর গলায় বললেন, "কাস্টমার কোথায় কাকে ফোন করে, এটা দেখা যেমন আমার কাজ নয়, উচিতও নয়।"

এর উপর আর কথা চলে না। ঝিনুকরা এসে গাড়িতে বসেছিল। দূরে শ্রবণার দিদার বাড়িটা দেখা যাচ্ছে, দীপকাকু সেদিকে তাকালেন না। আশুদাকে বললেন, তালতলা থানা চলো।"

থানায় দেখা হল ওসি পার্থ মজুমদারের সঙ্গে। দীপকাকু ঠিকই বলেছিলেন, খুবই সপ্রতিভ, ভাল ব্যবহার। সাদরে ডেকে নিলেন ঝিনুকদের। দীপকাকু বললেন, "ডায়েরিটা কিন্তু এখন দিচ্ছি না।"

"না না, রাখুন না আপনার কাছে।" বলে, চা আনতে পাঠালেন পার্থবাবু। তারপর দীপকাকুর উদ্দেশে বললেন, "কী বুঝলেন লেখাগুলো দেখে? শুধুই পাগলের প্রলাপ, নাকি সত্যিই কোনও কাজে আসবে আপনার?"

"মনে তো হচ্ছে খুবই কাজে আসবে। এ ছাড়াও আর একটা জিনিস আপনার কাছে আমার জানার আছে," বলেন দীপকাকু।

"বলুন।"

"ঘুমের ওষুধের নমুনাটা আপনারা শুধু গ্লাসেই পেয়েছিলেন, নাকি বোতলের মধ্যেও ছিল?"

"যতদূর মনে পড়ছে দুটোতেই ছিল। কেন বলুন তো?" দীপকাকুর প্রশ্নের উত্তরে জানতে চান পার্থবাবু।

দীপকাকু বলেন, "একটু ভেবে, কাগজপত্তর দেখে আমার সেলফোনে জানালেও চলবে। সেই বোতল, গ্লাস কি এখনও আপনাদের কাছে আছে?"

ওসি পার্থ মজুমদারের চোখে তখন বিস্ময়ের দৃষ্টি। একটু সময় নিয়ে বলেছিলেন, "কেসটা যখন প্রমাণিত হয়েই গেছে, ওসব রাখার আর কোনও মানে হয় না। রিপোর্টটুকু রেখে ওগুলো ডেসট্রয় করে দেওয়া হয়েছে।"

"পেলে সুবিধে হত।" বলে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন দীপকাকু। তারপর কী একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "আর একটা উপকার কি আমার করতে পারবেন?"

"নিঃসঙ্কোচে বলুন।" বলেছিলেন পার্থবাবু।

দীপকাকু বলেন, "অপরাজিতা দেবীর বাড়িটা সবসময় লক্ষ রাখার জন্য দুজন সাদা পোশাকের পুলিশ দু'দিনের জন্য বহাল করতে হবে। আপনাকে তো আগের দিনই বলেছি, মৃত্যুর হুমকি দিয়ে ওঁকে চিঠি পাঠানো হচ্ছে।"

উত্তরে পার্থবাবু বলেছিলেন, "হিসেবমত এই সার্ভিসটা আমাদের দেওয়ার কথা নয়। কেননা ভদ্রমহিলা নিজে আমাদের কাছে কোনও সাহায্য চাননি। তবু আপনি যখন বলছেন, সে ব্যবস্থা আমি করব। অবশ্যই এর বদলে আপনাকেও একটা ব্যাপারে কথা দিতে হবে।"

Thebanet

"কী কথা?" ভ্রূ কুঁচকে জানতে চেয়েছিলেন দীপকাকু।

পার্থবাবু বলেন, "ইনভেস্টিগেশন কমপ্লিট হলে, তার সবিস্তার বর্ণনা একদিন এখানে এসে দিতে হবে আমাকে।"

ক্ষণিকের জন্য হাসি ফিরে এসেছিল দীপকাকুর মুখে। বলেছিলেন, "অফকোর্স। তবে এর মধ্যেই হয়তো আরও কয়েকবার আপনাকে আমার দরকার হতে পারে। তারপর ডায়েরিটা ফেরত দেওয়ার ব্যাপারটাও আছে।"

পার্থবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঝিনুকরা এখন মহাত্মা গাঁধী রোড ধরে কলেজস্ট্রিট মোড়ে চলে এসেছে। বাঁ দিকে গাড়ি ঘোরাতে বললেন দীপকাকু। কিছুদূর গিয়েই আর একটা গলি ধরল ঝিনুকরা। গাড়িতে বসেই ঝিনুক দেখতে পেল, পুরনো দোতলা বাড়ির একতলায় 'মাইল স্টোন' লেখা গ্লো সাইনবোর্ড। অর্থাৎ এটাই সত্যবান মিত্রর বড় ছেলের অফিস।

গাড়ি সাইড করতে বলে নেমে গেলেন দীপকাকু। ঝিনুকও সঙ্গে সঙ্গে যায়।

বাইরে থেকে বাড়িটা পুরনো লাগলেও অফিসটা ঝকঝকে। কিউবিক্‌ল করা বিশাল হলঘর। তবে কর্মী সংখ্যা নিতান্ত কম। ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা, সেন্ট্রালি এসি করা আছে। রিসেপশনে গিয়ে দীপকাকু নিজের কার্ড দিয়ে বলেন, "জয়ন্ত মিত্রর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

রিসেপশন টেবিলের ভদ্রমহিলা ইন্টারকমের রিসিভার তুলে ফিসফিস করে কী সব বলেন। ঝিনুক কিচ্ছু শুনতে পায় না। ফোনে এভাবে কথা বলতে পারাটা একটা বিশেষ গুণ। হয়তো গুণটার জন্যই মহিলা এই চাকরিটা পেয়েছেন।

রিসিভার নামিয়ে ভদ্রমহিলা হাতের ইশারায় হলঘরের কোণে কাঠের অ্যান্টিচেম্বার দেখিয়ে দেন।

ঝিনুক মনে করেছিল এই অফিসটার মানানসই মালিক জয়ন্ত মিত্র হয়তো খুব কেতাদুরস্ত সাহেবি লোক হবেন। চেম্বারে ঢুকে দেখা গেল মোটেই তা নয়। চেয়ার ছেড়ে উঠে দীপকাকুর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন জয়ন্ত মিত্র। ঝিনুকের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় হল। ফের চেয়ারে বসে জয়ন্তবাবু আপ্লুত কণ্ঠে বললেন, "আমার খুব এক্সাইটিং লাগছে জানেন, লাইফে ফার্স্ট টাইম কোনও রক্তমাংসের গোয়েন্দা আমার কাছে এলেন। এতদিন তো শুধু বইয়ের পাতায় পড়েছি। আমি আবার খুব ডিটেকটিভ গল্পের ভক্ত। বলুন, কী নেবেন, হট না কোল্ড?"

"চা-ই বলুন।" বললেন দীপকাকু।

ইন্টারকম তুলে চায়ের নির্দেশ দিলেন জয়ন্ত মিত্র। তারপর বললেন, "এবার বলুন, আপনাদের জন্য কী করতে পারি?"

বাতানুকূল পরিবেশের কারণেই হয়তো দীপকাকু এখন অনেক শান্ত, স্বাভাবিক। বেশ গুছিয়ে শুরু করলেন, "আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। যে তদন্তের কারণে আমার আসা, তার সঙ্গে সরাসরি কোনও যোগ নেই আপনার। তবু এই কেসে আপনি যদি সামান্য সহযোগিতা করেন, খুব উপকার হয়।"

"এ কী, আপনি এত হেজিটেট করছেন কেন! যা জানতে চান, নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞেস করুন।" বলেন জয়ন্ত মিত্র।

দীপকাকু বলেন, "আপনার বাবা শ্রী সত্যবান মিত্র যে বাড়িতে ভাড়া থাকতেন, সে বাড়িতে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে।"

কথার মাঝেই জয়ন্ত মিত্র বলে ওঠেন, "জানি।"

দীপকাকু, ঝিনুক দু'জনেই ভীষণ বিস্মিত হয়। দীপকাকু বলেন, "কী জানেন?"

"ওই তো, আমি কেন বাবার জিনিসপত্তরগুলো তুলে নিচ্ছি না। ওগুলো ফেলতেও পারছেন না ওঁরা। সম্ভবত সেই কারণেই আপনাকে পাঠানো হয়েছে।"

জয়ন্তবাবুর কথা শুনে ঝিনুকরা স্বস্তির শ্বাস ফেলে। দীপকাকু বলেন, "হ্যাঁ, এই সমস্যাটা তো আছেই। এ ছাড়াও একটা বিপদে পড়েছেন অপরাজিতা দেবী।"

"কীরকম বিপদ?" জানতে চান জয়ন্ত মিত্র।

দীপকাকু বলেন, "ঠিক আছে, সে কথায় না হয় পরে আসছি, তার আগে আপনার ব্যাপারটায় পরিষ্কার হয়ে নেওয়া যাক। আপনি বলুন তো, কেন বাবার জিনিসপত্তরগুলো নিচ্ছেন না?"

এবার যেন একটু গম্ভীর হয়ে যান জয়ন্ত মিত্র। খানিকক্ষণ সময় নিয়ে বলেন, "এ ব্যাপারে একটা গোপন কথা আপনাকে বলতে হয়। আমি কি আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি?"

"পারেন।" বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন দীপকাকু।

ভরসা পেয়ে জয়ন্ত মিত্র বলেন, "সত্যি কথা বলতে কী, আমিও ক'দিন ধরে আপনার মতো একজনকে খুঁজছিলাম। হয়তো ভগবানই আপনাকে পাঠিয়ে দিলেন। আমি আবার খুব ঈশ্বরে বিশ্বাস করি।" বলে আঙুলে বেশ বড়সড় কালীমূর্তির আংটিটা দেখালেন।

"ভাল কথা, যেটা বলতে যাচ্ছিলেন, সেটা বলুন," প্রসঙ্গে ফিরিয়ে আনেন দীপকাকু।

জয়ন্তবাবু শুরু করেন, "বাবা মারা যাওয়ার পর প্রথমটায় অভিমানে সত্যিই আমি জিনিসগুলো নিতে যাইনি। বাবা চিরকাল সংসারের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন সব সময়। আমাদের মানুষ করেছেন মা। পরিবারের প্রতি বাবার অবজ্ঞা মাকেও খুব কষ্ট দিত। মা মারা যাওয়ার পর বাবা যেন আরও দূরে সরে গেলেন। কখন কোথায় থাকেন, কী করেন, কিছুই জানতাম না আমরা। এমনকী কলকাতায় এসে আছেন, তাও আমি খবর পাই অন্য এক সূত্রে।"

"তারপর আপনি দেখা করতে যান।" বলেন দীপকাকু।

"হ্যাঁ। এবং যথারীতি বাবা আমাকে পাত্তা দেন না। কিছু অপমানজনক কথাও বলেন।"

"যেমন?" জানতে চান দীপকাকু।

"বাবা বললেন, 'তুমি কেন এসেছ জানি, বিষয়-সম্পত্তির লোভে। দাঁড়াও, আগে মরতে দাও।' যে-কোনও সন্তান এই কথা শোনার পর পিতার মুখ আর দেখত না। আমি শুধু কর্তব্যবোধ থেকেই মাঝে-মাঝে গেছি। ছোটভাই তো কোনও যোগাযোগই রাখে না। বাবার শরীরটা দিন-দিন খারাপ হচ্ছিল, একদিন ডাক্তার নিয়ে গিয়েছিলাম, দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিলেন। তখন কি জানতাম সেদিনই তাঁর শেষ দিন!" বলে চুপ করে গেলেন জয়ন্ত মিত্র। সম্ভবত শোক সামলে নিচ্ছেন। মুখে যাই বলুন, বোঝাই যাচ্ছে বাবার প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা কিছু কম ছিল না জয়ন্তবাবুর।

খানিক নীরবতার পর দীপকাকু বলেন, "আমরা কিন্তু মূল জায়গা থেকে সরে এসেছি। কথা হচ্ছিল আপনার বাবার জিনিস..."

কথার মাঝে জয়ন্তবাবু বলেন, "ওই যে বলছিলাম, প্রথমদিকে অভিমানে জিনিসগুলো নিতে না গেলেও, পরে আমি বাড়ির মালিকের অসুবিধে উপলব্ধি করি। সবে ভাবছি, বাবার ফ্ল্যাটটা এবার খালি করে দিয়ে আসা উচিত, তখনই এল বিচ্ছিরি একটা চিঠি।"

"চিঠি!" সবিস্ময়ে বলে ওঠে ঝিনুক।

দীপকাকুর ভ্রূ কুঁচকে গেছে। জানতে চান, "কীরকম চিঠি?"

"দাঁড়ান, দেখাচ্ছি।" বলে জয়ন্তবাবু ড্রয়ার টেনে বের করে আনেন একটা ফুলস্কেপ বন্ড পেপার, যার উপর কম্পিউটারে টাইপ করা কিছু বাংলা অক্ষর।

কাগজটা নিয়ে চোখ বোলান দীপকাকু। কৌতূহল দমন না করতে পেরে ঝিনুকও পাশ থেকে ঝুঁকে পড়ে। চিঠিতে লেখা, 'জানি, সত্যবান মিত্রর মহামূল্যবান জিনিসটা এখন তোমার কাছে। ওটা এক সপ্তাহের মধ্যে চাই। যদি রাজি থাকো, নিজের গাড়ির পিছনের কাচে কালীর পোস্টার লাগাও। যোগাযোগ করে নেব। রাজি না হলে মৃত্যুর দিন গোনো।'

ঝিনুকের মাথা ঝিমঝিম করছে, এ তো প্রায় একই রকম চিঠি, অপরাজিতা দেবীকে যেমনটা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ দুষ্কৃতী নিজেই

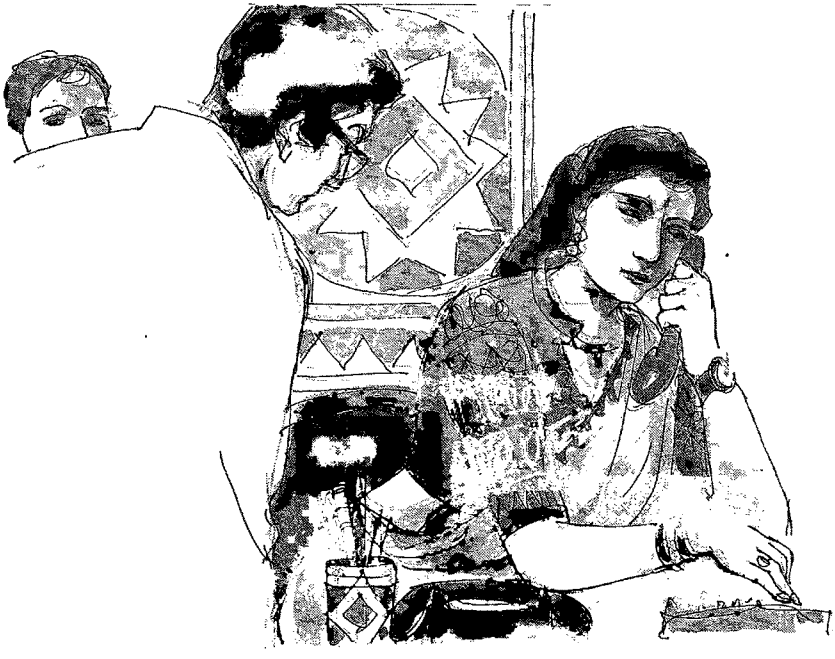

ভাল করে জানে না, মহামূল্যবান বস্তুটি কার হেফাজতে আছে। তবে এটা থেকে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেল, অপরাজিতা দেবীর কেসের সঙ্গে মৃত সত্যবানবাবু কোনওভাবে জড়িয়ে আছেন। দীপকাকু আন্দাজ করেছিলেন ঠিকই, কী করে করেছিলেন কে জানে! সে যাই হোক, রহস্য তো আরও জটিল হয়ে গেল!

দীপকাকু চিঠিটা পড়তে-পড়তে প্রায় চশমায় ঠেকিয়ে ফেলেছেন। কী দরকার বাবা, পকেটে তো ম্যাগনিফায়িং গ্লাস আছেই। চিঠিটা জয়ন্তবাবুকে ফেরত দিয়ে দীপকাকু জানতে চাইলেন, "ক'দিন হল চিঠিটা পেয়েছেন?"

"দিন দশেক হল।"

"গাড়ির পিছনের কাচে পোস্টার সেঁটেছেন?" জানতে চান দীপকাকু।

জয়ন্তবাবু বলেন, "কেন সাঁটতে যাব? কী ছাই মূল্যবান জিনিস, আমি নিজেই জানি না।"

দীপকাকু জিজ্ঞেস করেন, "তারপর আর কোনও চিঠি, অথবা অন্য কোনওভাবে যোগাযোগ করেনি?"

"করেছিল। ফোন করে হুমকি দিল, 'অযথা দেরি করছেন জয়ন্তবাবু, আরও সাতদিন সময় দিলাম। নইলে মৃত্যু নিশ্চিত।'"

জয়ন্তবাবুর কথার পিঠে ঝিনুক বলে ওঠে, "ফোনের গলাটা নিশ্চয়ই বাজখাঁই টাইপের?"

উত্তরে জয়ন্তবাবু বলেন, "ঠিক তাই। তুমি কী করে জানলে?"

একটু হলে ঝিনুক বলে ফেলতে যাচ্ছিল ওদের বাড়িতে আসা সেই ফোনের কথা, দীপকাকুর চোখ কটমটানি দেখে শুধরে নেয়। বলে, "আসলে এইসব ফোনে তো ওরকমই গলা আসে।"

ঝিনুকের কথা চাপা দিতে দীপকাকু তাড়াতাড়ি জয়ন্তবাবুকে জিজ্ঞেস করেন, "চিঠিটা পাওয়ার পর পুলিশে জানাননি কেন?"

"কী হবে জানিয়ে? জানেনই তো, পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা। এখন তবু লোকটা বলছে জিনিসটা আমার কাছে আছে, পুলিশ বলবে, কী আছে আমাদের দেখান। দু'পক্ষ সামলানো আমার কম্মো নয়। এমনিতে বিজনেসের কাজে সারাটাদিন ব্যস্ততায় কাটে আমার।"

জয়ন্তবাবুর কথার উত্তরে দীপকাকু বলেন, "কিন্তু ওরা যে আপনাকে মৃত্যুর হুমকি দিচ্ছে?"

"দিক। আমি জানি, আমাকে মারা ওদের উদ্দেশ্য নয়। আসল লক্ষ্য জিনিসটা পাওয়া। সেটা যখন আমার কাছে নেই, খামকা ভয় পাব কেন!" বললেন জয়ন্তবাবু।

সাহসী সিদ্ধান্ত। ঝিনুক ভাবে, অপরাজিতা দেবীও তেমন ভয় পাননি, ভয় পেয়েছে ওঁর মেয়ে-জামাইরা। তার মানে জিনিসটা অপরাজিতা দেবীর কাছেও নেই। কার কাছে আছে সেই মহামূল্যবান বস্তু, যা ভীষণভাবে খুঁজে যাচ্ছে দুষ্কৃতী? আর বস্তুটিই বা কী?

ঝিনুকের মনের কথাটি দীপকাকু এবার জিজ্ঞেস করেন, "চিঠি পড়ে বোঝা গেল, কোনও একটি মহামূল্যবান বস্তু আপনার বাবার কাছে ছিল। আপনার কোনও ধারণা আছে, কী হতে পারে সেটা?"

চিন্তিত মুখে মাথা নাড়েন জয়ন্তবাবু। হয়তো এটা নিয়ে আগেও ভেবেছেন। একটু সময় নিয়ে বলেন, "একটা ব্যাপার আপনাদের বলতে পারি, আমার বাবার কাছে আর্থিক মূল্যে খুব দামি কিছু থাকার সম্ভাবনা কম। টাকা-পয়সার দিকে বাবার কোনওদিনই ঝোঁক ছিল না। যদি কিছু থেকেই থাকে, অন্য অর্থে দামি।"

দীপকাকু বলেন, "এই চিঠিটা পাওয়ার পর আপনি তো অনায়াসে

বাবার ঘরে গিয়ে দেখতে পারতেন, সেরকম বিশেষ কিছু আছে কি না?"

"মাথা খারাপ আপনার! দেখছেন, কিছু না নিতেই চিঠি দিচ্ছে। বাবার ঘরে ঘুরে এলে তো কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে জিনিসটা চাইবে।" বলে কী একটু ভেবে নিয়ে জয়ন্তবাবু আবার বললেন, "সত্যি কথা বলতে কী জানেন, বাবার সাবজেক্ট ও রিসার্চ নিয়ে আমি কোনওদিনই তেমন মাথা ঘামাইনি। সেই সংক্রান্ত যদি কিছু হয়, আমি তা বুঝতেই পারব না।"

কথা শেষ হতে না-হতেই দীপকাকু বলেন, "সেই কারণেই আপনি আর ও বাড়িতে যাননি।"

"এগজ্যাক্টলি। ঠিক ধরেছেন।"

কথাবার্তার মাঝে একজন ট্রে হাতে চা নিয়ে ঢুকল। জয়ন্তবাবু বললেন, "নিন, একটু চা খান।"

বেয়ারা তিনজনের সামনে চায়ের কাপ নামিয়ে দিল। দীপকাকুর হাতে এখনও সেই চিঠি, বললেন, "এটা কি আমি ক'দিনের জন্য রাখতে পারি?"

"কেন নয়। অবশ্যই রাখতে পারেন। ইন ফ্যাক্ট, আমি সেই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম, শুধু চিঠি নয়, আপনি যদি এই কেসটাও হাতে নেন, খুব ভাল হয়।" বললেন জয়ন্তবাবু।

দীপকাকু চার ভাঁজ করে চিঠিটা শার্টের পকেটে পুরে চায়ের কাপটা তুলে নেন। তারপর বলেন, "আপনি যেরকম স্টেডি, মনে হয় না আমার কোনও সাহায্য আপনার দরকার হবে।"

প্রশংসোটা জয়ন্তবাবুকে আরও বিনয়ী করে তুলল। বিগলিত হেসে বললেন, "আসলে তা নয়, একটু ভয়-ভয় তো করছেই। এসব আপনারাই ভালভাবে ..."

কথা শেষ হওয়ার আগেই একটা বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটে গেল। দীপকাকুর হাত থেকে চায়ের কাপটা ফসকে সোজা মেঝেতে। লাফিয়ে উঠেছে ঝিনুক। কাপ ভেঙে ছত্রখান। চা ছিটিয়ে পড়েছে দীপকাকুর শার্টে, টেবিলে। বিষম লজ্জায় দীপকাকু একটু বেসামাল হয়ে পড়েছেন, নিজেই হাত দিয়ে টেবিলের চা মুছতে লাগলেন, নিচু হয়ে তুলতে গেলেন ভাঙা কাপের টুকরো। জয়ন্তবাবু মানা করছেন। বলছেন, "ছেড়ে দিন, আমার লোক এসে তুলে দেবে।" কিন্তু কে শোনে কার কথা, দীপকাকু কী যে করছেন, নিজেই বুঝতে পারছেন না। এরই মধ্যে একবার কম্পিউটারে ধাক্কা মেরে বসলেন। জয়ন্ত মিত্র ইন্টারকমে বেয়ারাকে ডাকলেন। পুরো ঘটনায় ঝিনুকেরও ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে।

বেয়ারা এসে ব্যাপারটা মোটামুটি সামলে নিল। দীপকাকু চেয়ারে বসে হাঁফাচ্ছেন আর বলছেন, "আই অ্যাম রিয়েলি ভেরি সরি। আই অ্যাম ..."

"ও কে, ইট্স অল রাইট। আপনি মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছেন। এরকম হতেই পারে। ইট্স অ্যান অ্যাকসিডেন্ট। তবে আপনার শার্টটাও খারাপ হয়েছে।" বলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করলেন জয়ন্তবাবু।

দীপকাকু আর বেশিক্ষণ বসলেন না। একটু পরেই চেয়ার থেকে উঠে বললেন, "আজ তা হলে চলি। আপনার অনেক সময়, একটা চায়ের কাপ নষ্ট করলাম।"

জয়ন্ত মিত্র হেসে বলেন, "ছাড়ুন তো মশাই। একটা কাপ ভাঙলে আমি গরিব হয়ে যাব না। আবার আসবেন। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে বেশ ভাল লাগল।"

নমস্কার বিনিময় করে বেরিয়ে আসছিল ঝিনুকরা। জয়ন্ত মিত্র ডাকেন, "সরি মিস্টার বাগচী, আপনি কিন্তু আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছেন।"

ঘুরে দাঁড়িয়ে দীপকাকু জানতে চান, "কী কথা।"

"বাবার ঘরটা ছাড়াও অপরাজিতা দেবী কী একটা সমস্যায় যেন পড়েছেন ..."

"হ্যাঁ, তবে যা বুঝলাম, সে ব্যাপারে আপনিও বোধহয় কোনও সাহায্য করতে পারবেন না। চলি।"

জয়ন্ত মিত্রর অফিস থেকে বেরিয়ে ঝিনুকরা গাড়িতে গিয়ে বসে। দীপকাকু গম্ভীর গলায় আশুদাকে ধর্মতলার দিকে গাড়ি চালাতে বলেন। আবার কোথায় যাচ্ছেন কে জানে! শ্রবণারা চিন্তা করে মরছে।

দীপকাকুর মুখ আবার গভীর চিন্তামগ্ন। ভ্রু দুটো সামান্য কুঁচকে আছে। শার্ট ভর্তি চায়ের দাগ। কী বিচ্ছিরি কাণ্ডটাই না করলেন। ঝিনুকের বুঝতে অসুবিধে হয় না, কিছুটা নার্ভাস হয়েই কাপটা হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল দীপকাকুর। জয়ন্ত মিত্রর কাছে একইরকম চিঠি দেখে সমস্ত ক্যালকুলেশন এলোমেলো হয়ে গেছে। ব্যাপারটা একেবারে অপ্রত্যাশিত।

রাস্তায় এখন ঝাঁঝাঁ রোদ। মানুষজন, গাড়ির ভিড়। আশুদা স্পিড তুলতে পারছে না। দীপকাকু সিগারেট ধরিয়েছেন। ধীরে-ধীরে চোখেমুখে প্রশান্তি ফিরে আসছে। হঠাৎই দীপকাকু বলে ওঠেন, "তা হলে ঝিনুক, একটা ব্যাপার অন্তত মিলল।"

প্রশ্ন না করে পরের কথাটার জন্য অপেক্ষা করে ঝিনুক। দীপকাকু বলেন, "যে জিনিসটার জন্য এত হুমকি, চিঠি, সেটার মালিক আসলে ছিলেন সত্যবান মিত্র। এখন মালিক বদলে গেছে।"

ঝিনুক বলে, "এমনও তো হতে পারে, জিনিসটা এখনও সত্যবানবাবুর ঘরেই কোথাও লুকনো আছে। আড়ালে থাকা লোকটা অযথা সন্দেহ করছে জয়ন্ত মিত্র আর অপরাজিতা দেবীকে।"

একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে দীপকাকু বলেন, "সে সম্ভাবনা খুব কম। দুষ্কৃতী যেমন অপরাজিতা দেবীর ঘর লণ্ডভণ্ড করেছে, তার আগে সত্যবানবাবুর ঘরটাও দেখে নিয়েছে ভালভাবে। ও বাড়ির সব তালার চাবি করানো আছে লোকটার কাছে।"

"আপনি কী করে বুঝলেন সত্যবানবাবুর ঘরে জিনিসটা খোঁজা হয়েছে?" জানতে চায় ঝিনুক।

একটু গর্বের সুরে দীপকাকু বলতে থাকেন, "সত্যবানবাবুর ঘরে ঢুকে আমি কী-কী জিনিস লক্ষ করছিলাম মনে করে দ্যাখো, প্রথমে বুক কেসের কাছে যাই। দেখি, বেশ কিছু বই উলটে করে সাজানো আছে, তাড়াহুড়ো এবং বইয়ের প্রতি দরদ না থাকলে এটা হয়। তারপর দেখি, মেঝেতে পুরনো ছাপের সঙ্গে চটি ও জুতোর কিছু টাটকা ছাপ, যা শোওয়ার ঘর থেকে বাথরুম অবধি গেছে। দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলোর পিছনটাও দেখেছিলাম, ফ্রেমগুলো সেন্টারে ছিল না। দু'চারটে শো পিস ড্রয়িংয়ে যা ছিল, সেগুলোও সরানো হয়েছে, পুরনো অবস্থানে সে সবের ছাপ এখনও স্পষ্ট। সব শেষে যেটা আমি দেখি, অ্যাশট্রের মধ্যে টাটকা কিছু সিগারেটের ফিল্টার। তখনই নিশ্চিত হয়ে যাই, সত্যবানবাবুর মৃত্যুর অনেকদিন পরে দু'জন দুষ্কৃতী এই ঘরে এসেছিল। যাদের একজন চটি পরেছিল, অন্যজন জুতো।"

দীপকাকুর পর্যবেক্ষণ সত্যিই বাহবা পাওয়ার যোগ্য, এই নিয়ে উনি গর্ব করতেই পারেন। কিন্তু একটা খটকা যে থেকেই যাচ্ছে। সেটাই জানতে চায় ঝিনুক, "সত্যবানবাবুর ঘরের বেলায় ওরা দিব্যি সবকিছু গুছিয়ে দিয়ে গেল, অপরাজিতা দেবীর ক্ষেত্রে বিপরীত আচরণ কেন?"

"এর একটা কারণ হয়তো, সত্যবানবাবুর ঘরে যে সময়টা দুষ্কৃতীরা পেয়েছিল, অপরাজিতা দেবীর ঘরে সেটা পায়নি। দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে, জিনিসটা না পেয়ে ওরা ক্রমে অধীর এবং মরিয়া হয়ে উঠছে। তারই প্রকাশ দেখা গেছে অপরাজিতা দেবীর ঘরে।"

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ সিগনালে অনেকক্ষণ দাঁড়ানোর পর গাড়ি আবার ছাড়ল। আর একটা কথা খেয়াল হল ঝিনুকের, "আচ্ছা, লোকগুলো কি জয়ন্তবাবুর ঘর লণ্ডভণ্ড করেছে?"

দীপকাকু বলেন, "উনি যখন সে ব্যাপারে কিছু বললেন না, ধরে নেওয়া যায় সেরকম কোনও ঘটনা ওঁর ক্ষেত্রে ঘটেনি। হয়তো ওঁর বাড়ির নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভাল।"

ফাঁকা রাস্তা পেয়ে বেশ স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছে আশুদা। ঝিনুক দীপকাকুকে জিজ্ঞেস করে, "আমরা নিশ্চয়ই এখন অপরাজিতা দেবীর বাড়ি যাচ্ছি?"

"না। লাঞ্চ করতে যাচ্ছি আমিনিয়ায়।"

দীপকাকুর কথা শুনেই খিদে পেয়ে যায় ঝিনুকের। আশুদা বলে, "সেই ভাল, আমারও তেল রিজার্ভে চলে গেছে।"

কথাটা প্রথমে ধরতে পারে না ঝিনুক, গাড়ি নিয়ে বেরিয়েই ট্যাঙ্কফুল করিয়েছেন দীপকাকু, এখনই কী করে তেল রিজার্ভে চলে যায়। পরক্ষণেই আশুদার কথার আসল মানেটা বুঝতে পেরে হেসে ফেলে ঝিনুক, আশুদারও খিদে পেয়েছে।

হোটেলে খুবই পরিতৃপ্তি করে খেয়ে ঝিনুকরা এখন ক্রিক রো-তে চলে এসেছে। সামান্য এই রাস্তাটুকু গাড়ির সিটে মাথা হেলিয়ে ঝিমিয়ে নিচ্ছেন দীপকাকু। এত সমস্যার মধ্যে কী করে যে ঘুমোন মানুষটা, কে জানে!

অপরাজিতা দেবীর বাড়ির গেট বন্ধ। দু'বার হর্ন দেয় আশুদা। তাতেই চটকা ভাঙে দীপকাকুর। চোখ কুঁচকে দু'পাশের জানলার বাইরেটা দেখে বলেন, "যাক, পুলিশের লোকদু'টো আছে তা হলে।"

ঝিনুক অবাক হয়ে বলে, "কোথায় তারা?"

"পাঁচিলের গায়ে ঝুপড়ির সামনেটা দ্যাখো, তাস খেলছে দু'জনে। ফুটপাথবাসীর ছদ্মবেশ নিয়েছে।"

দীপকাকুর কথা মিলিয়ে নিতে ঝিনুক আড়চোখে ঝুপড়ির দিকে তাকায়, সত্যিই নোংরা পোশাকে দু'জন লোক তাস খেলা বন্ধ রেখে ঝিনুকদের গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে।

গেট খুলল বিনায়কদা। গাড়ির জানলার কাছে এসে কী যে বলল, বোঝা গেল না। অপরাজিতা দেবী অপেক্ষায় আছেন, সেটাই জানাল বোধহয়। গাড়ি পোর্টিকোর নীচে দাঁড়ানোর আগে ঝিনুক জানলা দিয়ে দেখল, শ্রবণা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে, নতুন করে কিছু ঘটেনি। ঝিনুকের কেমন জানি একটা আশঙ্কা মনে গেঁথে গেছে, প্রতিটা মুহূর্তে মনে হচ্ছে কিছু ঘটবে। এবং একইসঙ্গে দীপকাকু নতুন কোনও পথের সন্ধান পাবেন।

হোটেলে খেতে বসে জয়ন্তবাবুর থেকে নিয়ে আসা চিঠিটা ফের বের করেছিলেন দীপকাকু। তখন কিন্তু ম্যাগনিফায়িং গ্লাসের সাহায্য নেন। খানিকক্ষণ পরীক্ষা করার পর, প্যান্টের পকেট থেকে বের করলেন দোমড়ানো-মোচড়ানো একটা কাগজ। চিঠির কাগজের মতোই। তার উপর অবশ্য বেশ কিছু ইংরেজি অক্ষর। দুটো কাগজ পাশাপাশি রেখে আতস কাচ দিয়ে কী যেন খুঁটিয়ে দেখলেন। ধীরে ধীরে তাঁর মুখে ফুটে উঠল হাসি। নিজেকেই যেন বলে উঠলেন, "আমার সঙ্গে চালাকি!"

ঝিনুক তক্ষুনি বিষয়টা জানতে যাচ্ছিল, দীপকাকু হাতের ইশারায় ঝিনুককে থামিয়ে দিয়ে বলেন, "আগে খেয়ে নাও, ক্রমে সব জানতে পারবে।"

সেই সময় বেয়ারা গরম-গরম খাবার নামিয়ে দিচ্ছে টেবিলে। তারপর আর কথাটা তোলার সুযোগ পায়নি ঝিনুক। গাড়িতে উঠেই ঘুমিয়ে পড়লেন দীপকাকু।

বিনায়কদাকে অনুসরণ করে ঝিনুকরা দোতলায় উঠে এসেছে। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে শ্রবণা। ঝিনুককে দেখে উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চায়, "কী হয়েছে তোর হাতে?"

কনুইয়ের কাটাটা ভুলেই গিয়েছিল ঝিনুক। এখন শুধু ব্যান্ড এড লাগানো আছে। ঝিনুক বলে, "ও কিছু না। একটু ছড়ে গেছে।"

শ্রবণা আশ্বস্ত হয়ে ঝিনুকদের ড্রয়িংয়ে বসতে বলে দিদাকে ডাকতে যায়।

ড্রয়িংয়ে ঢুকেই বুক শেল্‌ফের কাছে চলে গেছেন দীপকাকু। ঝিনুক ক্লান্ত হয়ে সোফার আশ্রয়ে। বইগুলো দেখতে-দেখতে দীপকাকু বলেন, "ভদ্রমহিলার বিভিন্ন বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ, অনেক ধরনের রেয়ার সব বই আছে।"

কথা শেষ হতেই ঘরে ঢোকেন অপরাজিতা দেবী। পায়ের শব্দে দীপকাকু ঘুরে দাঁড়ান। অপরাজিতা দেবীর মুখ আজ ভীষণ থমথমে। ভয়ে মানুষের মুখ এমনটা হয় না। তা হলে কি অন্য কিছু ঘটেছে?

অবসন্ন পায়ে সোফায় এসে বসেন অপরাজিতা দেবী। ওঁর সঙ্গে শ্রবণাদের না দেখে একটু অবাক হয় ঝিনুক। সোফায় বসে সেই প্রশ্নটাই দীপকাকু একটু অন্যভাবে করেন, "আপনার মেয়ে-জামাইরা এখন নেই নাকি বাড়িতে?"

উত্তরে অপরাজিতা দেবী বলেন, "জামাইরা নেই। দুই মেয়ে আর নাতনি আছে। আমিই ওদের এ ঘরে আসতে বারণ করেছি।"

"কারণ?" জানতে চান দীপকাকু।

"আপনার সঙ্গে একান্তে আমার কিছু কথা আছে।" বললেন অপরাজিতা দেবী। ঝিনুক প্রমাদ গোনে, এই হয়তো ওকে উঠে যেতে বলা হবে।

না, তা হল না। অপরাজিতা দেবী তৃতীয় চিঠিটা আঁচলের আড়াল থেকে বের করে দীপকাকুর হাতে দিলেন। বললেন, "এটা পড়ে নিন আগে। তারপর কথাটা বলছি।"

চিঠিটায় একবার চোখ বুলিয়ে ঝিনুকের হাতে সেটা চালান করে দেন দীপকাকু। ঝিনুক দেখে, "শ্রবণা ফোনে যা বলেছিল অবিকল তাই লেখা আছে, মিছিমিছি দেরি করছেন ম্যাডাম। মৃত্যু ততই ..."

অপরাজিতা দেবী বলতে শুরু করেছেন, "আপনাকে না জানিয়েই আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সত্যি কথা বলতে কী, লাস্ট চিঠিটা পাওয়ার ঘণ্টাখানেক পর ডিসিশনটা আমি নিই। তখন আর ফোনে আপনাকে যোগাযোগ করা যায়নি।"

"সিদ্ধান্তটা যদি একটু বলেন।" বিনয়ের সঙ্গে জানতে চান দীপকাকু।

অপরাজিতা দেবী বলেন, "হিসেবমতো আর একদিন সময় আছে। তারপরই চিঠির লোকটা যে জিনিসটা চাইছে সেটা আমায় তুলে দিতে হবে। জিনিসটা কী এখনও আমি জানি না।" একটু থামলেন অপরাজিতা দেবী। ফের বললেন, "আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, ওই গয়নাগাঁটি অথবা কিছু পুরনো নথির মধ্যেই লুকিয়ে আছে মহামূল্যবান জিনিসটা।"

"পুরনো নথি বলতে?" কথার মাঝে প্রশ্ন করেন দীপকাকু।

অপরাজিতা দেবী বলেন, "এই ধরুন কিছু চিঠি, দলিল ... যেগুলো দেখে আমি সেরকম কিছু উদ্ধার করতে পারিনি। প্রসঙ্গত একটা কথা বলি, আমার শ্বশুরমশাই জমি বন্ধক রেখে টাকা ধার দিতেন। সেরকম বেশ কিছু দলিল এ বাড়ির আলমারিতে আছে।"

"বুঝলাম। তারপর বলুন।" বলেন দীপকাকু।

"আমার এক দূরসম্পর্কের ভাশুর, আমার স্বামীর কাকার ছেলে, থাকেন শিলিগুড়িতে। আমার হাজব্যান্ডের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। তিনি এ বাড়ির ইতিবৃত্ত অনেকটাই জানেন। আমার ধারণা, উনি জিনিসগুলো দেখলে আন্দাজ করতে পারবেন মূল্যবান জিনিস কোনটি। তাই আমি ঠিক করেছি আর সময় নষ্ট না করে কালই শিলিগুড়ি যাব।"

"সে কী, এত বড় ঝুঁকি নেবেন আপনি। এতে আরও সুবিধে হয়ে যাবে ওদের। সহজেই জিনিসগুলো আপনার থেকে ছিনিয়ে নেবে।" আশঙ্কিত গলায় বলেন দীপকাকু। কী একটু ভেবে নিয়ে আবার বলেন, "আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই মেয়ে-জামাইরা কেউ যাচ্ছে? তারা কি এ ধরনের হামলা সামলাতে পারবে?"

"না, তারা কেউ যাচ্ছে না। তারা জানেই না আমি কাল শিলিগুড়িতে যাচ্ছি। শেষ মুহূর্তে বলব। সত্যি কথা বলতে কী, আমি কারও উপরই ভরসা করতে পারছি না।"

ভীষণ অবাক হয়ে দীপকাকু জানতে চান, "আপনি একলা

যাবেন?"

মৃদু হেসে অপরাজিতা দেবী বলেন, "না, আপনারা আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবেন। আপনার সঙ্গে ঝিনুকেরও টিকিট কেটে রেখেছি। এখন যদি আপনারা না যেতে চান আমাকে একলাই যেতে হয়।"

এই প্রথম ঝিনুকের এক অদ্ভুত মিশ্র অনুভূতি হয়, ভয় আর আনন্দ একসঙ্গে। এরকম একটা অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ সহজে আসে না। একাগ্র চিত্তে দীপকাকু কী যেন ভেবে যাচ্ছেন। একটু পরে মুখ তুলে বলেন, "কোন ট্রেনে টিকিট হয়েছে?"

"পার্জিলিং মেলে। এ সি-তে করতে বলেছিলাম। প্রচুর ওয়েটিং। স্লিপার ক্লাসে আর এ সি হয়েছে। আশা করি কালকের মধ্যে কনফার্মড হয়ে যাবে।"

দীপকাকুর পরের প্রশ্ন, "কাকে দিয়েছিলেন টিকিট করতে?"

"কাছেই একটা ট্র্যাভেল এজেন্সিতে। বিনায়ক গিয়ে টিকিট নিয়ে এসেছে।" বলে টিকিটটা দীপকাকুর দিকে বাড়িয়ে দেন অপরাজিতা দেবী।

টিকিটটা দেখতে-দেখতে দীপকাকু বলেন, "বিনায়ক তো জেনে গেল আপনি শিলিগুড়ি যাচ্ছেন।"

"ও আমার অনেকদিনের লোক। কাউকে কিছু বলবে না। বারণ করা আছে।" বেশ আস্থার সঙ্গে কথাটা বললেন অপরাজিতা দেবী।

উত্তরে দীপকাকু বলেন, "আপনি বোধহয় কাজের লোকেদের উপর বেশিই বিশ্বাস করেন। যে-কারণে আমাকে না জানিয়ে রঘুর ছুটি মঞ্জুর করে দিয়েছেন।"

সঙ্গে-সঙ্গে অপরাজিতা দেবীর মুখে অপরাধী ভাব ফুটে ওঠে। বলেন, "সত্যি আমার খুব ভুল হয়ে গেছে। শ্রবণা পরে বলেছে আপনারা নাকি আগেই আন্দাজ করেছিলেন রঘু পালিয়ে যাবে। আসলে কী করে ওকে অবিশ্বাস করি বলুন তো। বাইরের সব কাজ, এমনকী ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা — সব রঘুকে দিয়েই করাতাম।" একটু থেমে অপরাজিতা দেবী আবার বলেন, "আচ্ছা, রঘু কেন পালাল, আন্দাজ করেছেন কিছু?"

দীপকাকু বলেন, "এখন বলব না। ট্রেনে যেতে-যেতে বলব। তার আগে আপনার আর এক বিশ্বস্ত লোকের সঙ্গে একটু কথা বলতে হবে। লক্ষ্মীকে একটু পাঠিয়ে দিন।"

"এক্ষুনি দিচ্ছি।" বলে উঠে গেলেন অপরাজিতা দেবী।

সঙ্গে-সঙ্গে ঘরে ঢুকল শ্রবণা। ঝিনুকের উদ্দেশে বলল, "শোন না একটু বাইরে।"

না গেলে খারাপ দেখায়। যতই হোক, বন্ধু। বাধ্য হয়ে উঠতে হল ঝিনুককে। শ্রবণার পিছু-পিছু বারান্দায় আসার সময় দেখল, কাঁচুমাচু মুখে লক্ষ্মীমাসি সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে। ইস, এই জেরা পর্বটা অজানা থেকে যাবে, ভেবে আক্ষেপ হয় ঝিনুকের।

বারান্দায় এসে শ্রবণা প্রথমেই জিজ্ঞেস করে, "হ্যাঁ রে, কেসটার কতদূর কী সমাধা করলেন তোর দীপকাকু?"

আর একটু হলে আগামীকাল শিলিগুড়ি যাওয়ার প্রোগ্রামটা বলে ফেলতে যাচ্ছিল, খেয়াল পড়ে অপরাজিতা দেবীর কথা, উনি এখনও বাড়ির কাউকে কিছু বলেননি। ঢোঁক গিলে ঝিনুক বলে, "আশা করি দু-একদিনের মধ্যেই কিছু একটা রেজাল্ট পাওয়া যাবে।"

"তাই যেন হয় বাবা। দিদার বাড়িটা আমার কাছে কত শান্তির জায়গা ছিল বল তো! দিব্যি ছুটি কাটাতে আসতাম। কী বিচ্ছিরি সব ঘটনা ঘটতে লেগেছে।"

শ্রবণার কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে একটু যেন ভরসা পেয়েছে দীপকাকুর তদন্ত। ভরসাটা কী কারণে এসেছে, পরের প্রশ্নে তা বোঝা গেল, "আচ্ছা, রঘু যে কেটে পড়বে, তোরা কী করে জানলি? ও-ই কি মেন কালপ্রিট? নাকি ওকে দিয়ে অন্য কেউ এসব করাচ্ছে?"

উত্তরে ঝিনুক গম্ভীরভাবে বলে, "এখনই সেটা সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে রঘু যে সুবিধের লোক নয়, সেটা স্পষ্ট।"

"কীভাবে বুঝলি?" অপার কৌতূহলে জানতে চায় শ্রবণা।

এবার আর নিজেকে সংযত করতে পারে না ঝিনুক, এখনও তার বীরত্বের কথা কাউকে ভালভাবে জানানো হয়নি। পেট ফুলছে। বন্ধুদের কাছে এসব গল্প করার মজাই আলাদা। রঘুকে চেজিং-এর ঘটনাটা বলতে শুরু করে ঝিনুক। বিস্ময়ে শ্রবণার চোখ বড়-বড় হয়ে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ড্রয়িং থেকে বেরিয়ে আসে লক্ষ্মীমাসি। তার মানে জেরা শেষ। ঝিনুক ঘরে ফিরতে গিয়ে দেখে, অপরাজিতা দেবীও ড্রয়িংয়ে ঢুকছেন।

অপরাজিতা দেবীকে দেখে দীপকাকু বলেন, "আপনাকে আর একটু কষ্ট দেব। গয়নাগুলো, আগের চিঠিদুটো আর সেই সব দলিল-দস্তাবেজ, যা আপনার মনে হয়েছে মূল্যবান হলেও হতে পারে, সবকিছু দেখতে চাই। ওগুলো দেখার সময় কেউ যেন এই ঘরে না আসে, আপনিও না।

অপরাজিতা দেবীর কাছ থেকে আজকের মতো বিদায় নিয়ে ঝিনুকরা আবার গাড়িতে। বাড়ির রাস্তা ধরেছে আশুদা। দীপকাকু ভীষণভাবে কী যেন ভেবে যাচ্ছেন। চোখ বন্ধ। হাতের তালুতে থুতনি। ভাবনার অবশ্য অনেক রসদই পেয়েছেন অপরাজিতা দেবীর দেখানো জিনিসগুলো থেকে। সোনার দু'তিনরকম হার। বিভিন্ন পাথর বসানো আংটি। মুক্তোর মালা। সোনার উপর পাথর বসানো কোমরবন্ধটা পরীক্ষা করতে-করতে দীপকাকু বললেন, "এটা রুপোর উপর জল করা। পাথরগুলো আসল।"

কথামতো পরীক্ষা চলার সময় ও বাড়ির কেউ ঘরে ছিল না। পুরনো দলিলগুলো যত্ন করে খুলে দেখলেন দীপকাকু। সব মিলিয়ে প্রায় চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ মিনিট টাইম লাগল। তারপর থেকে দীপকাকু একটা কী দুটো কথা বলেছেন। এই মৌন আর কতক্ষণ চলবে, কে জানে!

ঝিনুকের ভাবনার মাঝে নড়েচড়ে বসেন দীপকাকু। পকেট থেকে সেলফোন বের করে সুইচ টিপতে থাকেন। ফোন কানে তুলে খানিক অপেক্ষার পর হতাশ হয়ে বলেন, "নাঃ, এখনও চালু করেনি।"

কিছু না বুঝে দীপকাকুর দিকে তাকিয়ে থাকে ঝিনুক। দীপকাকু বলেন, "যে নম্বরে ফোন করেছিল রঘু, কানেকশনটা এখনও চালু করেনি। লোকটাকে আমার ভীষণ দরকার।"

হঠাৎ আবার সেই লোকটার খোঁজ কেন, ধরতে পারে না ঝিনুক। দীপকাকু নিজের মনেই বলে ওঠেন, "অঙ্কটা মিলেও মিলছে না। রঘুব্যাটাই শুধু গরমিল।"

ফের খানিকক্ষণ নীরবতা। ঝিনুকরা রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশনের কাছে পৌঁছে গেছে। আর একটু পরেই বাড়ি। দীপকাকু পকেট থেকে ছোট্ট একটা চিরকুট বের করেন, ফোন নম্বর আর কী সব লেখা। চিরকুটের নম্বর দেখে ফের ফোন করেন। এবার অপর প্রান্ত সাড়া দেয়। দীপকাকু বলেন, "হ্যালো, আমি কি সৌগত ভট্টাচার্যর সঙ্গে কথা বলছি?"

...

"ইমপ্রেশন সাইবার কাফে তো আপনার, আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। একপাতা বাংলা টাইপ করাব আমি। আজ রাত দশটার মধ্যে দিতে পাববেন?"

...

"কী ফন্ট ইউজ হয় আপনার? বিদিশা? কেন, দুর্গা হবে না?"

...

"ঠিক আছে, বিদিশাতেই করে দেবেন। আমি আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছচ্ছি।" বলে সজোরে ফোনের সুইচ অফ করলেন দীপকাকু। একইসঙ্গে প্রবল উচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন, "আই হ্যাভ ডান ইট। সেম ভয়েস।"

ঝিনুক কিন্তু সেই অগাধ জলে। একটা জিনিস বুঝতে পারছে, দীপকাকু ফোন করেছিলেন রঞ্জনবাবুর দেওয়া সেই সাইবার কাফের

pathagar.net

ঠিকানায়। যে অ্যাড্রেসে রাজেশ সাংভির নামে ফোনের কানেকশন নেওয়া ছিল। ওই ফোনেই যোগাযোগ করেছিল রঘু। কিন্তু দীপকাকুর উচ্ছ্বাসের কারণটা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। ফোনের আসল মালিককে তো পাওয়া যায়নি। ঠিকানা ভুল। তা হলে? ঝিনুক ঘুরিয়ে দীপকাকুকে জিজ্ঞেস করে, "আপনি সত্যিই কি এখন বাংলা টাইপ করাতে যাবেন নাকি? আমাদের পাড়াতেও একজন টাইপ করে দেয়। তবে কী ফন্ট ইউজ করে জানি না।"

ঝিনুকের কথার ধার দিয়েই গেলেন না দীপকাকু। আত্মগত ভাবে বলতে লাগলেন, "অপরাজিতা দেবীকে দেওয়া তিননম্বর চিঠিটা অন্য কেউ দিয়েছে। ওই একটা চিঠির ফন্ট আলাদা। বাকি সব চিঠি, এমনকী জয়ন্ত মিত্রর চিঠিটাও দুর্গা ফন্টে ছাপা। নানান সম্ভাবনার কথা ভাবতে-ভাবতে, এখন অবধি আমাদের তদন্তের সমস্ত খুঁটিনাটি বিচার করতে গিয়ে খেয়াল পড়ল, রঞ্জনের কাছে শোনা সাইবার কাফেটার কথা, যেখানে তৃতীয় চিঠি প্রিন্ট হলেও হতে পারে। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ল, রঘু ফোন করে পালানোর পর আমি যখন রিডায়াল করি, একজন বাঙালি কথা বলেছিল, রাজেশ সাংভি নামে কোনও অবাঙালি নয়। এখন ইমপ্রেশনে ফোন করতে দেখি, সেই একই গলা। মানে সৌগত ভট্টাচার্যর। অতএব যা দাঁড়াল, রাজেশ সাংভির নামে নেওয়া কানেকশনটা সৌগতরই।"

"অন্য নামে কানেকশন নেওয়ার কারণ?" জানতে চায় ঝিনুক।

"সম্ভবত গোপন কাজকর্ম ওই ফোনেই সারে। থার্ড চিঠিটা কোথাও গিয়ে ছাপতে চাইলে সহজে রাজি হবে না।"

দীপকাকুর কথার পিঠে ঝিনুক বলে, "সৌগত ভট্টাচার্য গোপন কানেকশনের ঠিকানাটা এক রাখল কেন? মিথ্যে অ্যাড্রেস দিয়ে রাখতে পারত।"

একটু যেন সহানুভূতির সুরে দীপকাকু বলেন, "খুবই অ্যামেচার অপরাধী। সদ্য লাইনে এসেছে। তাই এত অসতর্ক।"

এবার ঝিনুক গম্ভীর হয়ে যায়। একটু ভেবে নিয়ে বলে, "তা হলে যা বোঝা গেল, রঘু তিননম্বর হুমকির চিঠিটা দিয়েছে এবং মূল অপরাধীর সঙ্গে রঘু নেই। সুযোগ বুঝে দাঁও মারতে চাইছিল। কিন্তু কোথায় যেন একটু খটকা লাগছে।"

"কোথায়?" উদাসভাবে জানতে চান দীপকাকু।

"রঘু কি অত ভাল বাংলা লিখতে পারে?"

ঝিনুকের মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হেসে দীপকাকু বলেন, "মাথাটা বেশ খুলেছে দেখছি।"

পরের কথায় আর যাওয়া গেল না। বাড়ি পৌঁছে গেছে ঝিনুকরা। এখন প্রধান কাজ, শিলিগুড়ি যাওয়ার ব্যাপারে মায়ের থেকে পারমিশন বের করা।

## ॥ পাঁচ ॥

রাত আটটা বেজে দশ। গতকাল মাকে অনেক কষ্টে রাজি করিয়ে ঝিনুক, দীপকাকু এখন শিয়ালদা এনকোয়ারির সামনে। দার্জিলিং মেল আটটা চল্লিশে। অপরাজিতা দেবী এখনও এসে পৌঁছননি। অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন দীপকাকু। ঝিনুকেরও টেনশন হচ্ছে। আদৌ এসে পৌঁছবেন তো? দীপকাকু ফোনে অপরাজিতা দেবীকে বলেছিলেন, 'আপনাকে বাড়ি থেকে তুলে নেব।' উনি রাজি হননি। বলেছেন, 'আমি চাই না, আপনারা সঙ্গে যাচ্ছেন, এটা কেউ জানুক। মেয়ে-জামাইদের এখনও কিছু বলিনি। ভাবছি, চিঠি লিখে লক্ষ্মীর কাছে রেখে যাব। আর বিনায়ককে সঙ্গে নিয়ে আটটার সময় শিয়ালদা এনকোয়ারির সামনে পৌঁছচ্ছি।'

তার মানে মেয়ে-জামাইদের উপর সন্দেহ তাঁর যথেষ্ট। দীপকাকুও তাঁদের সন্দেহের বাইরে রাখেননি। ঘটনা কোনদিকে গড়াবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এদিকে হুমকির চিঠি অনুযায়ী আজই শেষ দিন। বদমাইশ লোকটা অপরাজিতা দেবীকে টার্গেট করেছে বেশিবার। তুলনায় জয়ন্ত মিত্রকে কম। উনি মোটামুটি সাবলীল আছেন। তা হলে কি মহামূল্যবান জিনিসটা অপরাজিতা দেবীর কাছেই আছে?

প্রশ্নটা উলটে দীপকাকুই করেছিলেন ঝিনুককে। শিয়ালদা আসার সময় গাড়িতে বসে বলেছিলেন, 'তুমি তো কাল অপরাজিতা দেবীর জিনিসগুলো দেখলে। কী মনে হল, ওগুলোর মধ্যে সেই দুর্মূল্য বস্তুটি আছে?'

উত্তরে ঝিনুক বলেছিল, "আমি কি অত সব বুঝি? দলিল, পুরনো কাগজগুলোর মধ্যে কিছু থাকলেও থাকতে পারে। আর মুক্তোর মালাটাও একটু অন্যরকম, নবাবি আমলের গয়না হতেই পারে।"

"কিন্তু ওর মধ্যে কি 'রানির কান্না' লুকিয়ে আছে মনে হল?"

দীপকাকুর কথায় অবাক হয়ে ঝিনুক বলেছিল, "ঠিক বুঝলাম না। তবে 'রানির কান্না' কথাটা বেশ চেনা লাগছে।"

"চেনা লাগারই কথা। এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়াটা কাজের কথা নয়। সত্যবান মিত্রর ডায়েরিতে লেখা ছিল 'রানির কান্না নিরাপদে রাখলাম।" বলে গুম মেরে গিয়েছিলেন দীপকাকু।

ঝিনুক তো অবাক, ডায়েরির আর একটা কথার মানে করে ফেলেছেন দীপকাকু! মুক্তোর মালাটা কোনও এক রানির কাঙ্ক্ষিত জিনিস হতেই পারে। সম্ভাবনার কথা সঙ্গে-সঙ্গে দীপকাকুকে বলেছিল ঝিনুক।

উত্তরে দীপকাকু বলেন, "হলে তো ভালই হত। কাজটা সহজ হয়ে যেত আমাদের। কিন্তু সত্যবানবাবু আরও অনেক কথা লিখেছেন, 'রানির কান্না নিলনদে মিশে যায়', 'আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের লাইট হাউসের আলো যেন রানির অস্থির অসহায় চোখ' ... এরকম আরও অনেক মিশরের অনুষঙ্গ। যার সঙ্গে মুক্তোর মালাটার কোনও সম্পর্ক নেই। মালাটার বয়স বড়জোর কুড়ি, তিরিশ বছর। নবাবি আমলেরও নয়। গয়নাগুলো দেখার পর তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আমার এক চেনা স্বর্ণকারের কাছে দিই, উনি আমাকে এইসব তথ্য দেন। যদিও সবটাই আমার কথা শুনে।"

ঝিনুক আবার গাড্ডায় পড়ল। রহস্য উন্মোচনের যদি বা একটু আশা দেখা দিচ্ছে, পরক্ষণেই তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। ঝিনুকের কাছে এখনও পরিষ্কার নয়, তারা আসলে কী খুঁজছে, কাকেই বা দিচ্ছে প্রোটেকশন। ঘড়িতে এদিকে সাড়ে আটটা। হাতে মাত্র দশ মিনিট। দীপকাকু ক্রমপর্যায়ে নিজের ঘড়ি, পরেরবার স্টেশনের ঘড়ি দেখে যাচ্ছেন। অনেক আগে অ্যানাউন্স হয়ে গেছে, দার্জিলিং মেল ছ'নম্বর প্ল্যাটফর্মে। ঝিনুক প্রায় ধরেই নিয়েছে অপরাজিতা দেবী আসবেন না। এখন চিন্তা হচ্ছে, খারাপ কিছু ঘটে গেল না তো?

কোনও ডাউন লোকাল এসেছে প্ল্যাটফর্মে। সেই ভিড়টা স্টেশন চত্বর থেকে বেরিয়ে যেতেই দেখা যায় অপরাজিতা দেবীকে। পাশে ব্যাগ হাতে হাঁটছে বিনায়ক। আজ অপরাজিতা দেবীর চেহারাটা কেমন যেন ভীত, সন্ত্রস্ত লাগছে।

ঝিনুকদের কাছে এসে অপরাজিতা দেবী বললেন, "আমি খুবই সরি, আপনাদের অনেকক্ষণ উৎকণ্ঠায় রেখেছি।"

প্ল্যাটফর্মের দিকে যেতে-যেতে দীপকাকু বলেন, "কিন্তু আপনার এত দেরি হল কেন? জ্যামে পড়েছিলেন নাকি?"

উত্তরটা দেয় বিনায়ক, "না, না, জ্যাম নয়। ট্যাক্সিতে মায়ের শরীরটা হঠাৎ খারাপ করতে লাগল, গাড়ি থামিয়ে ওষুধ কিনে মাকে সুস্থ করে তারপর এলাম।" একটু দম নিয়ে বিনায়ক আবার বলে, "মাকে একটু সাবধানে নিয়ে যাবেন বাবু! ইদানীং শরীরটা একদম ভাল যাচ্ছে না।"

প্ল্যাটফর্মের গেটের কাছে এসে বিনায়ককে বিদায় দিলেন দীপকাকু। অপরাজিতা দেবীর সুটকেস এখন ঝিনুকের হাতে। সেই জিনিসটা হয়তো এতেই আছে। সুটকেসের হ্যান্ডল যথাসম্ভব চেপে ধরে ঝিনুক।

গাড়ি পাঁচ মিনিট লেট করে ছাড়ল। ঝিনুকদের আর এ সি টিকিট

কনফার্মড হয়ে গেছে। নির্দিষ্ট জায়গায় বসে অপরাজিতা দেবী এখন একটু ধাতস্থ। সুটকেসটা লোয়ার বার্থের নীচে না রেখে জানলার কোণে রেখেছেন। ছোট স্টেশনগুলোকে পাত্তা না দিয়ে ছুটে চলেছে ট্রেন। এতক্ষণে অপরাজিতা দেবী বলতে শুরু করেছেন শরীর খারাপের আসল কারণ, যা শুনতে-শুনতে ঝিনুক একেবারে থ। বুকের মধ্যে একটা অজানা ভয় খামচে ধরেছে। অপরাজিতা দেবীর ট্যাক্সিটা যখন সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ সিগনালে দাঁড়িয়ে ছিল, কে যেন একটা খাম ট্যাক্সির জানলা দিয়ে অপরাজিতা দেবীর কোলে ফেলে পালিয়ে যায়। খাম খুলে অপরাজিতা দেবী আবার একটা চিঠি পান।

সেই চিঠি এখন দীপকাকুর হাতে। ঝিনুক পাশ থেকে ঝুঁকে পড়ে নেয় বয়ানটা, 'পালিয়ে বাঁচতে পারবেন না। জিনিসটা ট্রেনেই ছিনিয়ে নেব।'

দীপকাকু চিন্তিত স্বরে বললেন, "সেই এক কাগজ, ফন্টটাও দুর্গা। লোকটা হয় নিজে ট্রেনে আছে অথবা গুণ্ডা রেখেছে জিনিসটা লুঠ করার জন্য। আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে।" চিঠিটা ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে বললেন, "আজ রাতটা সবাইকে জেগে কাটাতে হবে। কি ঝিনুক, পারবে তো?"

সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড় হেলায় ঝিনুক। মনে-মনে বলে, আপনি পারলে হয়, যা ঘুমকাতুরে!

নিচুগলায় অপরাজিতা দেবী জানতে চান, "দীপবাবু, আপনার কাছে পিস্তল আছে তো?"

কথাটা যেন শুনতেই পাননি, এইভাবে দীপকাকু বলেন, "যাই, একটু পায়চারি করে আসি। দেখি, আড়ালে থাকা বন্ধুদের চিনতে পারি কিনা।"

দীপকাকু বেরিয়ে গেলেন। পিস্তল আছে কি নেই, জানা গেল না। ঘটনা যেদিকে টার্ন নিচ্ছে, কেন জানি ঝিনুকের মনে হচ্ছে পিস্তলের দরকার পড়বে। বাবা সকালে একবার বলেছিলেন, "কী রে, আমার পিস্তলটা রাখবি নাকি? যদি দরকার পড়ে।"

ঝিনুক ইতস্তত করে নেয়নি। পিস্তল চালানোর প্রাথমিক ট্রেনিংটাও ঝিনুকের নেওয়া হয়নি। অথচ বাবার কাছে কবে থেকে লাইসেন্স্ড পিস্তলটা পড়ে আছে। ট্রেনিংটা যদি আজ সকালে নিতে যেত, মা নির্ঘাত পণ্ড করে দিত আজকের যাওয়া। এবারের কেসটা ভালয়-ভালয় মিটে গেলে বাড়ি ফিরেই বাবার কাছে পিস্তল চালানোর ট্রেনিংটা নিয়ে নেবে। আপাতত মার্শাল আর্টের সামান্য শিক্ষাই ঝিনুকের ভরসা।

সিটের উপর পা মুড়ে, সুটকেসে হেলান দিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে আছেন অপরাজিতা দেবী। ভীষণ আর্ত, অসহায় লাগছে তাঁকে। ঝিনুক আড়চোখে আশেপাশের সহযাত্রীদের উপর নতুন করে সন্ধানী দৃষ্টি বোলায়। আপার বার্থে দুটি নেপালি মেয়ে অনেকক্ষণ আগে উঠে গেছে। অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে দুজনে। ভাবসাব দেখে আন্দাজ করা যায় কলকাতার কোনও কলেজে পড়ে, ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছে। অপরাজিতা দেবীর বার্থের শেষ প্রান্তে ফ্লেঞ্চকাট দাড়িকে খুব একটা সুবিধের মনে হচ্ছে না। বয়স মধ্য-তিরিশ। গলায় সোনার মোটা চেন। হাতে সোনালি ব্যান্ডের ঘড়ি। চোখে রিমলেস চশমা। বাবু হয়ে বসে, এক থাইয়ের উপর নোটবুক রেখে কী যেন হিসেব করছেন, হিসেবটা মিলিয়ে নিচ্ছেন অন্য থাইয়ে রাখা ক্যালকুলেটর থেকে। সবই হয়তো ভড়ং। সময়মতো আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়বে।

এবার প্যাসেজের ও পারে সাইড বার্থ দুটোয় চোখ বোলায় ঝিনুক। আপারে সব চুল সাদা এক বৃদ্ধ ট্রেন ছাড়ার আগে সেই যে শুয়েছেন, আর ওঠেননি। বুকের উপর রাখা একটা ইংরেজি ম্যাগাজিন। কখনও পড়ছেন, কখনও বা চশমাটা খুলে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছেন। ভদ্রলোককে ট্রেনে তুলে দিতে দু'জন এসেছিল। সম্ভবত ওঁর দুই ছেলে।

নীচের বার্থে স্বামী-স্ত্রী। বেশিদিন বিয়ে হয়নি। দু'জনের চেহারা দেখে বোঝা যায় আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য নেই। চোখে-মুখে সন্ত্রস্ত ভাব। হঠাৎ কোনও দুঃসংবাদ পেয়ে বাড়ি ফিরছে হয়তো। রিজার্ভেশন এখনও কনফার্মড হয়নি, একটা বার্থই দু'জনকে শেয়ার করতে হবে।

সব মিলিয়ে যা দেখা গেল, ফ্লেঞ্চকাটই সন্দেহজনক। ভাবনাটা সেরে ফ্লেঞ্চকাটের দিকে তাকাতে গেছে ঝিনুক, দেখে, লোকটা তার দিকেই চেয়ে আছে। ঝিনুক চোখ সরানোর আগেই লোকটা বলে বসে, "কী দার্জিলিং? ক'বার হল?"

ভদ্রলোকের মুখে আলাপি হাসি। ঝিনুক কিছু বলতে যাবে, দীপকাকু এসে পড়লেন। ঝিনুক জানতে চায়, "কাউকে চোখে পড়ল?"

কিছু না বলে ঝিনুকের পাশে বসলেন দীপকাকু। অপরাজিতা দেবীও উত্তরের অপেক্ষায়। দীপকাকু দু'পাশে মাথা নাড়লেন।

দারুণ স্পিডে চলছে ট্রেন। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল বলে জানলার কাচ নামিয়ে দিয়েছেন দীপকাকু। বাইরে ঘন অন্ধকার। অপরাজিতা দেবী একইরকম ভাবে বসে আছেন। ঝিনুকেরও কিচ্ছু করার নেই। একটা গল্পের বই এনেছে বটে, এই সময় বের করতে কেমন জানি কুণ্ঠা হচ্ছে। তুলনায় দীপকাকু অনেক স্বচ্ছন্দ, ফ্লেঞ্চকাটের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিয়েছেন। ভদ্রলোক চা-ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। দীপকাকু চা-ব্যবসা সংক্রান্ত অনেক কথা বলে যাচ্ছেন। কী করে পারছেন কে জানে। নাকি দু'জনেই দক্ষ অভিনেতা!

অপরাজিতা দেবী সিট থেকে নেমে দাঁড়ালেন। বললেন, "মুখে-চোখে একটু জল দিয়ে আসি।"

ঝিনুক তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে, "চলুন, আমি সঙ্গে যাই।"

অপরাজিতা দেবী বাধা দেন, "না না, আসতে হবে না, এই তো দুটো কুপ পরেই বাথরুম। তা ছাড়া এখানেই তো সব রইল।"

ঠিকই বলেছেন অপরাজিতা দেবী। সুটকেসটা পাহারা দেওয়াই বেশি জরুরি। ওঁর হাতে এখন শুধু প্লাস্টিকের সুদৃশ্য টয়লেট ব্যাগ। বোধহয় বিদেশি। বেশ পছন্দ আছে বলতে হবে।

অপরাজিতা দেবীর একা যাওয়ার ব্যাপারে দীপকাকুও কিছু বললেন না। একইরকম ভাবে আলোচনায় মত্ত। কারও যখন কোনও টেনশন নেই, ঝিনুক খামকা কেন দুশ্চিন্তা করতে যাবে। উপরের বার্থের দুটো মেয়ে খিলখিল করে হাসছে। ওদের সঙ্গে আলাপ জমাতে পারলে বেশ হত। এই সব যখন ভাবছে ঝিনুক, দীপকাকু কানের কাছে ফিসফিস করে বলেন, "দুটো কোচ পরে একজন আছে। ছদ্মবেশে। বাকিদের এখনও চিনতে পারছি না। অপরাজিতা দেবীকে এখন কিছু বলার দরকার নেই।"

বুকটা ধক করে ওঠে ঝিনুকের। ভয়-ধরা গলায় বলে, "একজনকেই বা আপনি কী করে চিনলেন? কে সে?"

"রঘু।" বললেন দীপকাকু।

নামটা আর একবার উচ্চারণ করতে যাচ্ছিল ঝিনুক, অপরাজিতা দেবীকে ফিরে আসতে দেখে চুপ করে যায়। এখন ওঁকে বেশ ফ্রেশ লাগছে। সিটে গিয়ে বসলেন। ঝিনুকের মনের মধ্যে তোলপাড় চলছে, দীপকাকু যদি একবার রঘুকে দেখিয়ে দেন, ঝিনুক একাই মোকাবিলা করতে পারবে। কিন্তু সঙ্গে আর ক'জন আছে, তারা সশস্ত্র কিনা কিছুই জানা যাচ্ছে না।

প্যান্ট্রি কারের বয় ডিনারের অর্ডার নিতে এসেছে। দীপকাকু অর্ডার দিতে যাচ্ছিলেন, মানা করলেন অপরাজিতা দেবী। বললেন, "আমি তিনজনের খাবার নিয়ে এসেছি। আপনারা হাত-মুখ ধুয়ে আসুন।"

প্রথমে দীপকাকু, পরে ঝিনুক গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এল। কাগজের প্লেটে খাবার বেড়ে দিয়েছেন অপরাজিতা দেবী। পরোটা, মাংস, আচার, মিষ্টি। দারুণ রান্না। একেবারে মহাভোজ। চেটেপুটে খেলেন দীপকাকু। ঝিনুক ততটা তৃপ্তি করে খেতে পারল না। এই টেনশনে খাওয়া যায়!

রাত প্রায় বারোটা। কম্পার্টমেন্ট প্রায় অন্ধকার। প্যাসেজে শুধু নাইট ল্যাম্প জ্বলছে, আর সবাই ঘুমোলেও শুয়ে থেকে জেগে আছে ঝিনুকরা। মিড্‌ল বার্থ থেকে ঝিনুক যখনই লোয়ার বার্থের দিকে

ঝুঁকেছে, দেখছে চোখ চেয়ে আছেন অপরাজিতা দেবী। দীপকাকু ইতিমধ্যে দু'বার পায়চারি করে এসেছেন। শেষবার এসে বললেন, "ভেস্টিবিউলের দরজা টেনে দিয়েছে। এখন কম্পার্টমেন্টগুলো আলাদা। সম্ভবত রঘু আগের কোচেই রয়ে গেছে। অতএব রাতটুকু নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। দরজাও সব লক করা আছে।"

দীপকাকুর আশ্বাসবাণীর কারণেই কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল ঝিনুক। এমনকী ছোট্ট একটা স্বপ্নও দেখে ফেলল। ...মরুভূমির রাত। এদিক-ওদিক নানান উচ্চতার পিরামিড। মাথার উপর নক্ষত্রখচিত কালো আকাশ, কেউ কোথাও নেই। তবু কোথা থেকে যেন একটি মেয়ের কান্না ভেসে আসছে ...

দীপকাকুর ডাকে ঘুম ভাঙে ঝিনুকের। বলেন, "লাগেজ গুছিয়ে নাও। আর একঘণ্টা পরেই নিউ জলপাইগুড়ি।"

অপরাধী মুখে মিড্‌ল বার্থ থেকে নেমে আসে ঝিনুক। আশপাশের প্যাসেঞ্জাররা যে যার লাগেজ গোছাচ্ছে। জানলার বাইরে এখনও অন্ধকার। ভোর পাঁচটায় এন জে পি পৌঁছনোর কথা ট্রেনটার।

দীপকাকু, অপরাজিতা দেবী অনেক আগেই রেডি হয়ে বসে আছেন। মিড্‌ল বার্থ নামিয়ে, হাওয়া বালিশ, চাদর লাগেজে পুরে নেয় ঝিনুক। আর মাত্র এইটুকু পথ, আশা করা যায় কিছু ঘটবে না। ফ্রেঞ্চকাটকে এখন আর ততটা সন্দেহজনক মনে হচ্ছে না। ঘুম থেকে উঠেই আবার হিসেব নিয়ে বসে গেছে। সাইড বার্থের স্বামী-স্ত্রীকে দেখা যাচ্ছে না। আগের কোনও স্টেশনে নেমে গেছে বোধহয়। উপরের বার্থের বৃদ্ধ লোকটি নিজের ব্যাগ গোছাচ্ছেন। দীপকাকু হঠাৎ উঠে গিয়ে ভদ্রলোকের কাছে কী যেন চাইলেন। ট্রেনের আওয়াজে শোনা গেল না। ঝিনুক দেখল, ট্রেনে উঠে থেকে যে ম্যাগাজিনটা ভদ্রলোক পড়ছিলেন, সেটাই এগিয়ে দিলেন।

নিজের জায়গায় ফিরে এসে বইটার পাতা ওলটাচ্ছেন দীপকাকু। পুরো জার্নিটায় তেমন কিছু ঘটল না দেখে এক ধরনের আফসোস হচ্ছে ঝিনুকের। অপরাজিতা দেবী নিজের সিট থেকে উঠে এলেন, মনে হচ্ছে বাথরুম যাবেন। হাতে সেই স্টাইলিশ টয়লেট ব্যাগ। ঝিনুক ঠিক করেছে শিলিগুড়ি পৌঁছে অপরাজিতা দেবীর কাছে জেনে নেবে এই টাইপের ব্যাগ কোথায় পাওয়া যায়। এমন হতেই পারে, ঝিনুকের ভাল লাগা দেখে অপরাজিতা দেবী ব্যাগটা ঝিনুককে গিফ্‌ট করে দিলেন।

অপরাজিতা দেবী বাথরুমের দিকে চলে যাওয়ার পর প্যান্ট্রি কারের চাতালা এল। ফ্রেঞ্চকাট চাতালাকে দাঁড় করিয়ে বলল, "চার কাপ শুধু দুধ-জল ঢালো, টিব্যাগ আমার কাছে আছে।"

চাতালা নির্দেশমতো কাজ করছে। ফ্রেঞ্চকাট এবার দীপকাকুকে বলল, "আমাদের বাগানের চা খাওয়াব আপনাদের। সমস্ত বড়-বড় হোটেলে আমাদের কোম্পানির টি ব্যাগ ইউজ হয়।"

দীপকাকুর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, প্রস্তাবে অরাজি নন। ঝিনুক সতর্ক হয়। বলে, "আমি কিন্তু চা খাই না।"

ফ্রেঞ্চকাট হেসে বলে, "খাও। এখন খেতে চাইছ না। নিশ্চয়ই বাড়ি থেকে বেরনোর আগে মা বলে দিয়েছেন, ট্রেনে অচেনা কারও থেকে কিছু খাবি না।"

লোকটার কথায় গা জ্বলে গেলেও কোনও উত্তর দেয় না ঝিনুক। একটা কাপ ফেরত দিয়ে তিনটে কাপে টি ব্যাগ ডোবায় ফ্রেঞ্চকাট। অপরাজিতা দেবীরটা সিটে রেখে দীপকাকু ও ফ্রেঞ্চকাট মেজাজে চা খেতে থাকে। কেন যে দীপকাকু এত বড় ঝুঁকি নিচ্ছেন, কে জানে! টি ব্যাগে কিছু একটা মেশানো থাকতেই পারে। ফ্রেঞ্চকাট নিজের কাপে সেই চা ব্যাগটা ডোবাবে না, মার্ক করা আছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝিনুকের ভাবনা প্রায় সত্যে প্রমাণিত হয়। চা শেষ করে বিশাল একটা হাই তুললেন দীপকাকু। বইটা কোলের উপর রেখে চোখ বুজলেন। এবার নিশ্চয়ই নাক ডেকে ঘুমোবেন। ঝিনুক একা কী করে ফ্রেঞ্চকাটকে সামলাবে! এদিকে অনেকক্ষণ হয়ে গেল অপরাজিতা দেবী ফিরছেন না।

দীপকাকুকে ঠেলা দেয় ঝিনুক। ওষুধটা বোধহয় তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, চট করে ঘুম ভেঙে যায় দীপকাকুর। বলেন, "কী হল?"

"উনি অনেকক্ষণ হল বাথরুমে গেছেন। এতক্ষণে ফিরে আসা উচিত।" ঝিনুকের গলায় উৎকণ্ঠা।

সঙ্গে-সঙ্গে সোজা হয়ে বসেন দীপকাকু। কেন জানি প্রথমেই সাইড বার্থের আপারটা দেখে বলে ওঠেন, "মাই গড! নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে ওঁর!"

ঝিনুক আশ্চর্য হয়ে দেখে, সাইড আপার এখন বেমালুম ফাঁকা। বৃদ্ধ ভদ্রলোক দীপকাকুর কাছ থেকে বই ফেরত না নিয়েই নেমে গেছেন। কিন্তু কী করে নামবেন! ট্রেন তো এর মধ্যে কোথাও থামেনি।

দীপকাকু বাথরুমের দিকে দৌড়েছেন। ঝিনুক যেতে গিয়েও যায় না, এখানে অপরাজিতা দেবীর ব্যাগ। এই সুযোগে ফ্রেঞ্চকাট এসব নিয়ে সটকে যাক আর কী।

বেশ খানিকক্ষণ কাটল, দীপকাকুও ফিরছেন না। ভীষণ টেনশন হচ্ছে ঝিনুকের। এমন সময় ফ্রেঞ্চকাট বলে ওঠে, "কী ব্যাপার বলো তো, ভদ্রমহিলার কিছু হল নাকি? বাথরুমে পড়ে-টড়ে গেলেন না তো? যাই দেখি, মিস্টার বাগচী হয়তো একা সামলাতে পারছেন না।"

ফ্রেঞ্চকাট চলে যাওয়ার পর একা প্রবল উৎকণ্ঠায় বসে থাকে ঝিনুক। খানিকক্ষণ পরেই দেখা যায়, দীপকাকু আর ফ্রেঞ্চকাট পাঁজাকোলা করে অপরাজিতা দেবীকে নিয়ে আসছেন। অপরাজিতা দেবী সম্পূর্ণ অচৈতন্য।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই জ্ঞান ফিরে এল। সামান্য ধাতস্থ হতে না হতেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন অপরাজিতা দেবী। ঝিনুক তো কিছুই বুঝতে পারছে না। দীপকাকু সান্ত্বনার সুরে অপরাজিতা দেবীকে বলছেন, "ঘাবড়ে যাবেন না। কী হয়েছে খুলে বলুন। আমরা তো আছি। আপনার সেই ব্যাগটাই বা কোথায়?"

একটু সময় নিয়ে অপরাজিতা দেবী বললেন, "আমার ভুলেই এত বড় সর্বনাশটা হয়ে গেল। ওই ব্যাগেই সব কিছু রেখে, সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিলাম। আপনাদের উপর পুরোপুরি ভরসা রাখতে পারিনি। লাস্ট যখন বাথরুমে ঢুকলাম, কে যেন মুখে হাত চাপা দিয়ে কোমরে ইঞ্জেকশন ফুটিয়ে দিল। তখনই বুঝেছি শেষ হুমকিটা মিথ্যে দেয়নি বদমাইশটা। তারপর আর কিছু মনে নেই।"

দীপকাকু জানতে চান, "লোকটাকে কি একটুও মনে পড়ছে? সামান্য বর্ণনা দিতে পারেন?"

"হ্যাঁ, মাথার সব চুল সাদা। আর কিছু মনে পড়ছে না।"

সোজা হয়ে দাঁড়ালেন দীপকাকু। বললেন, "বুঝেছি। আজ ভোরেই লোকটাকে আমি চিনেছি। মুহূর্তের অসতর্কতায় কাজটা সেরে ফেলল। তবে ট্রেন যখন থামেনি, এখনও কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। দেখি পাওয়া যায় কিনা।"

দীপকাকু বেরিয়ে গেলেন। ঝড়ে বিধ্বস্ত ফুলগাছের মতো বসে আছেন অপরাজিতা দেবী। ফ্রেঞ্চকাট হতভম্ব। ট্রেনের স্পিড কমছে। জানলার বাইরে আবছা শহরতলি। অপরাজিতা দেবীর উপর বেশ অভিমান হচ্ছে ঝিনুকের। কেন যে উনি দীপকাকুর উপর ভরসা রাখতে পারলেন না।

একটু পরেই ফিরে এলেন দীপকাকু, দু'হাতে দুটি জিনিস। একটা সাদা পরচুলা, অন্যটা সেই টয়লেট ব্যাগ। বললেন, "বাথরুমের পাশেই পড়েছিল। আসল জিনিসগুলো নিয়ে ব্যাগটা ফেলে গেছে। লোকটা ছদ্মবেশ নিতে এক্সপার্ট। পরচুলাটা বদলে এখন হয়তো অন্য ড্রেস নিয়েছে। সব কম্পার্টমেন্ট ঘুরলাম, টয়লেটগুলো দেখেছি। কোথাও নেই। দেখি স্টেশনে যদি ধরতে পারি।" একটু থেমে দীপকাকু আবার বলেন, "আপনারা প্ল্যাটফর্মে নেমে রেল পুলিশে একটা ডায়েরি করবেন। আমি ততক্ষণ লোকটাকে খুঁজব।"

খুবই হতাশ ভঙ্গিতে কথাগুলো শুনলেন অপরাজিতা দেবী। আশা পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছেন। দীপকাকু টয়লেট ব্যাগ আর পরচুলো নিজের লাগেজে ভরে নিলেন। টয়লেট ব্যাগটাকে এখন আর ভাল লাগছে না ঝিনুকের। পরচুলোটাকেও সে চিনতে পেরেছে। সাইড বার্থের আপারে যে লোকটা শুয়েছিল, জিনিসটা তার।

ট্রেনের গতি একদমই কমে এসেছে। অল্প একটু প্রসাধন সেরে নিচ্ছেন অপরাজিতা দেবী। এরকম একটা মারাত্মক ঘটনার পর যা একটু বেমানান। দীপকাকুর কানের কাছে গিয়ে ঝিনুক জিজ্ঞেস করে, "রঘু কোথায়?"

"একই জায়গায় বসে আছে।" ফিসফিস করে বলেন দীপকাকু।

ঝিনুক বলে, "চলুন, গিয়ে ধরি।"

"না। ও যেমন আছে, থাক।"

ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়েছে। দীপকাকু কথামতো চলে গেছেন দরজার কাছে। নিজের লাগেজ তুলে নিয়েছেন অপরাজিতা দেবী। ঝিনুক নিজের আর দীপকাকুরটা নেয়।

প্ল্যাটফর্মে নামতেই একজন বয়স্ক ভদ্রলোক অপরাজিতা দেবীর দিকে এগিয়ে আসেন। সম্ভবত ইনিই অপরাজিতা দেবীর দূর সম্পর্কের ভাশুর। সঙ্গে একজন কাজের লোক, যে অপরাজিতা দেবীর হাত থেকে সুটকেসটা নেয়। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন, "পথে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?"

একমুখ হেসে অপরাজিতা দেবী বলেন, "না না, কোনও অসুবিধেই হয়নি। এই মেয়েটি ঝিনুক, আর ওর কাকা সঙ্গে ছিলেন।"

ঝিনুকদের ব্যাপারে ভদ্রলোক কিছুই জানেন না। ফলে চোখে প্রশ্ন।

অপরাজিতা দেবী বলেন, "চলুন, বাইরে গিয়ে ওর কাকার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।"

ঝিনুক দুটো ব্যাগ বইছে দেখে, ভদ্রলোক কাজের লোকটাকে ধমক দেন। কাজের লোক ঝিনুকের লাগেজ নিতে আসে। ঝিনুক প্রথমে দিতে রাজি হয় না। অপরাজিতা দেবীর মিথ্যাভাষণ তার পছন্দ হয়নি। গোটা ব্যাপারটাই কেমন যেন গোলমেলে লাগছে। একটা ব্যাগ পীড়াপীড়িতে দিতেই হয়।

ওভারব্রিজ পার করে ঝিনুকরা এখন স্টেশন কম্পাউন্ডের বাইরে। এখানে এসে দীপকাকুকে দেখা গেল মোবাইলে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। এগিয়ে এলেন কথা সেরে।

দীপকাকু কিছু বলার আগেই অপরাজিতা দেবী আলাপপর্ব শুরু করে দিলেন, "ইনি হচ্ছেন দীপঙ্কর বাগচী, আমাদের পাড়ায় থাকেন। বিজনেসের কাজে শিলিগুড়ি আসছিলেন, সুযোগ বুঝে আমি ওঁর সঙ্গ নিয়েছি। আর এই মিষ্টি মেয়েটির ভাল নাম নাম আঁখি। শ্রবণার বন্ধু, ছুটিতে কাকার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে।"

এরপর ভদ্রলোকের সঙ্গে ঝিনুকদের আলাপ করিয়ে দিলেন অপরাজিতা দেবী। ভদ্রলোকের নাম অভয় বসু। অভয়বাবু সবাইকে দাঁড় করিয়ে রেখে ড্রাইভারের খোঁজে গেলেন।

সেই ফাঁকে দীপকাকুর সামনে দাঁড়িয়ে অপরাজিতা দেবী বলেন, "মিথ্যে পরিচয় দিলাম বলে কিছু মনে করবেন না। জিনিসগুলো চুরি গেছে জানলে ভদ্রলোক ভীষণ কষ্ট পাবেন। আমাদের বাড়ির সব কিছুর প্রতি ওঁর গভীর মমতা।"

ভুরু কুঁচকে দীপকাকু বলেন, "আপনি ওঁর কাছে কী কারণে আসছেন জানাননি?"

"না। জিনিসগুলো হারানোর আশঙ্কা ছিল বলে ফোনে জানিয়েছিলাম, এমনিই বেড়াতে যাচ্ছি।" কথা বলতে-বলতে অপরাজিতা দেবী হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা চেক বের করে দীপকাকুর হাতে দিয়ে বলেন, "এটা রাখুন। আপনার বাকি পেমেন্ট। চার্জটা তো বলেননি, সাধ্যমতো দিলাম।"

দীপকাকু অপ্রস্তুত। বলেন, "সে কী, আপনার কাজটাই তো হল না।"

"সেটা না হওয়ার জন্য আমিই দায়ী। আপনি তো চেষ্টার ত্রুটি করেননি।"

অপরাজিতা দেবীর কথার মাঝে ফিরে আসেন অভয়বাবু। দীপকাকু চেকটা তড়িঘড়ি শার্টের পকেটে রাখেন। অভয়বাবু বলেন, "চলুন দীপঙ্করবাবু, কোথায় নামবেন, নামিয়ে দেব।"

"না। থ্যাঙ্ক ইউ। আমাদের নিতে একজনের আসার কথা।" বলে গুম মেরে গেলেন দীপকাকু। অপরাজিতা দেবীরা চলে যাচ্ছেন। দীপকাকুর দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানো। কাজ শেষ করতে না দিয়ে টাকা মিটিয়ে দেওয়াটা নিশ্চয়ই ওঁর সম্মানে লেগেছে। লাগারই কথা। ঝিনুকেরও ভীষণ খারাপ লাগছে।

কিন্তু এখন ঝিনুকদের করণীয় কী? কলকাতায় ফিরে যাবে? এসব ভাবনার মাঝে ঝিনুক দেখে, দীপকাকু চোখে বাইনোকুলার লাগিয়েছেন। লক্ষ্য অপরাজিতা দেবীদের যাওয়ার পথে। দূরবিন দিয়ে দেখার কী আছে বুঝতে পারে না ঝিনুক। এই তো বেশ খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে, অভয়বাবুরা কার পার্কিং থেকে একটু দূরে দাঁড়ানো একটা সুমো গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। অপরাজিতা দেবী হাঁটছেন খুঁড়িয়ে। কোমরে ইঞ্জেকশনের ব্যথাটা লুকোতে পারছেন না। তবে ভদ্রমহিলার মনের জোর দেখার মতো।

ঝিনুক দীপকাকুকে জিজ্ঞেস করে, "দূরবিন দিয়ে কী দেখছেন, গাড়ির নম্বর?"

দীপকাকুর তরফে কোনও উত্তর নেই। নিবিষ্ট মনে দেখেই যাচ্ছেন। অপরাজিতা দেবীদের নিয়ে সুমো গাড়িটা এগিয়ে যাচ্ছে, বড় একটা টার্ন-এর মুখে থামল। আর একটা লোক উঠছে। তখনই দীপকাকু বলে ওঠেন, "দূরবিনটা চোখে লাগিয়ে দ্যাখো তো, লোকটাকে চিনতে পারো কিনা?"

বাইনোকুলার চোখে দিয়েই ঝিনুক বলে ওঠে, "আরে! ও তো রঘু! অপরাজিতা দেবীর গাড়িতে উঠছে কেন?"

দীপকাকু বলেন, "রঘুর ক্রিয়াকলাপ গোড়া থেকেই আমার অনুসন্ধানকে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করেছে। এই মুহূর্তে সেই জট ছাড়ল।"

"কীরকম?" জানতে চায় ঝিনুক।

"রঘুই হচ্ছে অপরাজিতা দেবীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত কাজের লোক। যাকে ভাল বাংলায় বলে, বশংবদ। তিননম্বর চিঠির বয়ানটা অপরাজিতা দেবী নিজে লিখে রঘুকে দিয়ে ইমপ্রেশনে টাইপ করাতে পাঠিয়েছিলেন। বাংলা ফন্টের ব্যাপারে অপরাজিতা দেবীর সুস্পষ্ট ধারণা নেই। বড়জোর টাইপের সাইজটার জন্য কোনও ম্যাগাজিনের পাতা কেটে পাঠিয়েছিলেন। আগের চিঠিগুলো 'দুর্গা' ফন্টে ছিল, উনি জানতেন না। তিন নম্বর চিঠিতে 'বিদিশা' ফন্ট দেখে আমি সহজেই ধরে ফেলি, এটা অন্য কারও পাঠানো। ব্যক্তিটি রঘু নয়। তোমার কথামতো রঘুর পক্ষে সম্ভব নয় অত ভাল বাংলা লেখা। সে ফোন বুথ থেকে ইমপ্রেশনের মালিক সৌগত ভট্টাচার্যকে তাগাদা দিচ্ছিল চিঠির ব্যাপারে। অপরাজিতা দেবীর বাড়ি থেকে ফোন না করার কারণ সৌগতর মোবাইলের পরদায় ভেসে উঠবে ও বাড়ির নম্বর, অপরাজিতা দেবী কোনও সাক্ষী রাখতে চাননি।

"তারপর তোমার চেজিং-এর চোটে রঘু বাড়িছাড়া হল। তবে মাঝে এসে ওকে জিনিসপত্তর নিয়ে যেতে দেখে আমার সন্দেহ হয়, রঘুর সঙ্গে অপরাজিতা দেবীর নিশ্চয়ই আঁতাত আছে।"

দীপকাকুর কথার পিঠে ঝিনুক জানতে চায়, "অপরাজিতা দেবী নিজেই কেন নিজেকে চিঠি দিলেন? আর একটা ব্যাপার আশ্চর্য লাগছে, ট্রেনে রঘু কেন ছদ্মবেশে ছিল?"

দীপকাকু বলেন, "তোমার প্রশ্নদুটোর উত্তর হচ্ছে, অপরাজিতা দেবীর কাছে সত্যিই সেই মূল্যবান জিনিসটা আছে। কোনও কারণে জিনিসটা তাঁর শিলিগুড়িতে নিয়ে আসার দরকার পড়েছে। এখানে আসাটা যুক্তিসঙ্গত করার জন্যই ওই চিঠিটার ব্যবস্থা করেন উনি।

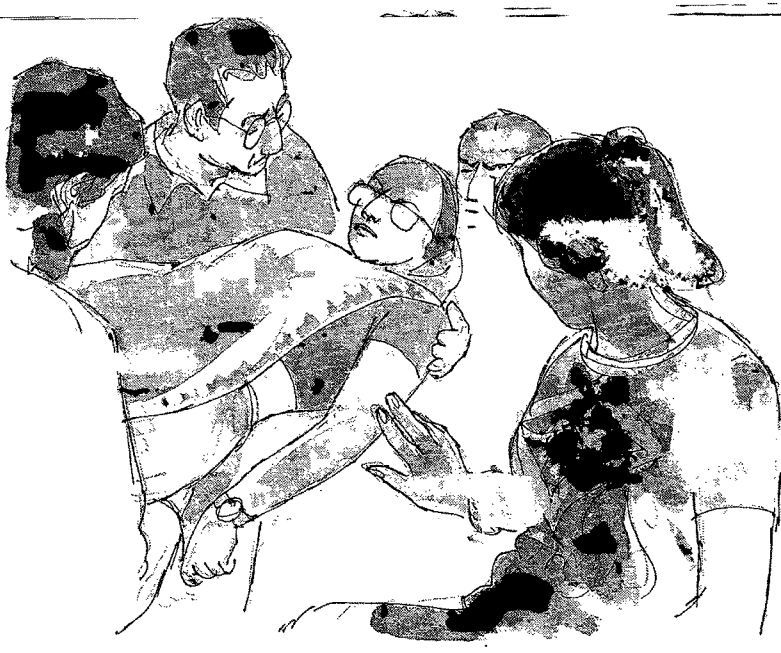

পাহারা দেওয়ার জন্য আমাদেরই বহাল করেন। দাড়িগোঁফ লাগিয়ে পাহারায় রঘুও ছিল দুটো কোচ পরে। বেশ কয়েকবার আমাদের কম্পার্টমেন্টে ঘুরেও গেছে। বেচারা জানত না, রাত্তিরবেলা ভেস্টিবিউলের দরজাগুলো বন্ধ হয়ে সে তার মালকিনের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আমাদের সাইড বার্থের সাদা পরচুলো লোকটা অনায়াসে কাজটা সারল। এখানে দুটো প্রশ্ন খচখচ করছে, বদমাইশ লোকটা কী করে আমাদের পাশেই রিজার্ভেশন পেল? রঘুর রিজার্ভেশন দুটো কোচের পরে কেন? উত্তরদুটো সম্ভবত এরকম, আমাদের টিকিট কেটেছে বিনায়ক। তার সঙ্গে নিশ্চয়ই অপরাধীর যোগাযোগ আছে, পরচুলো লোকটার বার্থ তাই আমাদের কাছাকাছি পড়েছে। অপরাজিতা দেবীর নির্দেশমতো রঘু টিকিট কাটে আলাদা।"

রুদ্ধশ্বাসে ঝিনুক বলে ওঠে, "বিনায়ককে তো এক্ষুনি অ্যারেস্ট করা উচিত।"

"এইমাত্র ফোনে তালতলার ওসি পার্থ মজুমদারকে সেটাই করতে বলেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিনায়ক অনেক কথা কবুল করবে। রঞ্জন মারফত শিলিগুড়ি পুলিশের সঙ্গেও কথা হয়ে গেল, ঘন্টাখানেকের মধ্যে অপরাধীকে ধরে ফেলছি আমরা।"

"কী করে?" বিস্ময়ের কণ্ঠে জানতে চায় ঝিনুক।

দীপকাকু বলেন, "ট্রেন থামার সঙ্গে-সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে নেমে লোকটাকে খোঁজার চেষ্টা করি আমি। কিছুতেই পাই না। শেষমেশ স্টেশনের বাইরে গিয়ে দাঁড়াই, প্রত্যেকটি যাত্রীর উপর নজর রাখতে গিয়ে দেখি, সাদা পরচুলোর সুটকেস নিয়ে এক পঞ্জাবি ভদ্রলোক ভাড়ার গাড়িতে উঠছে। এবং শুনলে অবাক হবে, লোকটা মোজা ছাড়া জুতো পরেছিল।"

এতে অবাক হওয়ার কী আছে, বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকে ঝিনুক। দীপকাকুর মুখে আগের সেই মিটিমিটি হাসি ফিরে এসেছে। বলেন, "সত্যবানবাবুর ডায়েরির একটা জায়গায় লেখা ছিল, 'মোজা ছাড়া জুতো পরা মানুষ সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে।'"

ঝিনুক সত্যিকারের হাঁ হয়ে গেছে, ওই তুচ্ছ কথাটার মধ্যে এত বড় সূত্র লুকিয়ে ছিল! দীপকাকু বলে যাচ্ছেন, "অতএব প্রমাণ হয়ে গেল, অপরাধীকে সত্যবান মিত্র আগেই চিনতেন। আর সে যে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে, সেটা বোঝা যায়, অতকটা চিঠি লেখা এবং একবার সত্যবানবাবুর ফ্ল্যাট, অন্যবার অপরাজিতা দেবীর ঘর তছনছ করা দেখে।"

ঝিনুক বলে, "সে না হয় হল, কিন্তু তাকে ধরবেন কীভাবে? আমরা তাকে ফলো না করে সেই থেকে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি।"

"শিলিগুড়ির পুলিশকে গাড়ির নম্বরটা ফোনে জানিয়েছি। ওরা খোঁজ নিচ্ছে গাড়িটা কোন হোটেল বা বাড়িতে গেছে। পুলিশ যখনই ফোনে আমাদের জানাবে, আমরা বেরিয়ে পড়ব। চলো, আপাতত চা খাওয়া যাক।" বলে দীপকাকু চায়ের দোকানের খোঁজে চললেন। ঝিনুক ব্যাগ কাঁধে তুলে অনুসরণ করল।

হোটেল 'হিমকন্যা'। এখানেই উঠেছে অপরাধী। একজন ওসি, দু'জন কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে দীপকাকু, ঝিনুক হোটেলের সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠছেন। একশো কুড়ি নম্বর রুম বুক করেছে লোকটা।

স্টেশনের টি স্টলে বসে যখন চা খাচ্ছিল ঝিনুকরা, তখনই শিলিগুড়ি পুলিশের ফোন আসে দীপকাকুর মোবাইলে। গাড়িটা কোন হোটেলে গেছে, লোকটা কোন ঘরে উঠেছে সব জানায়। দীপকাকু পুলিশকে হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে ট্যাক্সি ধরেন। ট্যাক্সিতে আর একটা কল আসে মোবাইলে। এ প্রান্তটুকু শুনে ঝিনুক

যতটা বুঝেছে, ফোনটা ওসি পার্থ মজুমদারের ছিল। বিনায়ক বোধহয় অনেক কথাই স্বীকার করেছে। ফোনে কথা বলতে-বলতে দীপকাকুর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল।

অবশেষে একশো কুড়ি নম্বর ঘর। দরজায় লাঠি দিয়ে টোকা মারছেন ওসি। খানিক পরেই দরজা খুলে যায়। সাদা পাজামা পাঞ্জাবি পরে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে এখানে আশাই করেনি ঝিনুক। ভদ্রলোক হলেন জয়ন্ত মিত্র। সত্যবানবাবুর বড় ছেলে। পুলিশ এবং ঝিনুকদের দেখে জয়ন্তবাবুও ভীষণ অবাক। বিস্ময়ের কণ্ঠে বলেন, "এ কী, আপনারা এখানে!"

কোনও ভনিতা না করে দীপকাকু বলেন, "জিনিসটা দিন।"

"কী জিনিস? কিসের কথা বলছেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।" বলেন জয়ন্ত মিত্র।

"এক্ষুনি বুঝতে পারবেন।" বলে দীপকাকু নিজে এগিয়ে যান বিছানায় রাখা সুটকেসের দিকে। ডালা খোলাই ছিল। জয়ন্তবাবু হয়তো এইমাত্র পোশাক বদলেছেন। একটু ঘাঁটাঘাঁটির পর জিনিসটা দীপকাকুর হাতে উঠে এল, আয়তাকার পোড়ামাটির একটা টালি। জিনিসটা পরিষ্কার করা হলেও তার প্রাচীনত্ব মোছা যায়নি। টালিটা আট বাই ছ'ইঞ্চি মতো হবে।

পুলিশ এবং ঝিনুক ঘিরে দাঁড়িয়েছে দীপকাকুকে। টালিটা খুঁটিয়ে দেখছেন দীপকাকু। একপিঠে পেরেকের মতো দেখতে অনেকগুলো আঁচড় খোদাই করা। আঁচড়ের উপর হাত বুলিয়ে দীপকাকু বলে ওঠেন, "কিউনিফর্ম, বাণমুখ লিপি।"

কথাটা চেনা-চেনা ঠেকে ঝিনুকের। পুলিশ অফিসার বলেন, "তার মানে এনশিয়েন্ট কিছু?"

"ইয়েস, অ্যাট লাস্ট আই গট ইট।" বলে জয়ন্তবাবুর দিকে ফেরেন দীপকাকু। বিছানায় হাল ছেড়ে দেওয়া অবস্থায় বসে আছেন জয়ন্ত মিত্র। দীপকাকু বলেন, "জয়ন্তবাবু, এই মাটির ট্যাবলেটটা কতটা মূল্যবান, কোনও ধারণা আছে আপনার?"

মাথা নাড়েন জয়ন্ত মিত্র। দীপকাকু আবার বলেন, "এর মূল্য না জেনেই বাবাকে খুন করে ফেললেন!"

চমকে মাথা তোলেন জয়ন্ত মিত্র। সঙ্গে-সঙ্গে অস্বীকার করেন, "কে বলেছে, বাবা খুন হয়েছেন?"

"আমি বলছি। আপনি যেদিন ডাক্তার বন্ধু নিয়ে বাবার শরীর পরীক্ষা করাতে যান, প্রথমবার ডাক্তারকে নিয়ে বেরিয়ে এলেও, আবার ঢোকেন একা। অপরাজিতা দেবীর কাজের লোক বিনায়ক সেটা দেখেছিল। বাবার সঙ্গে আপনার কথা কাটাকাটি হয়। কোনও এক ফাঁকে মদের বোতলে ঘুমের ট্যাবলেটগুলো ফেলে দেন। এমনই ট্যাবলেট, যাতে মদের স্বাদ বদলায় না। তালতলা থানায় সত্যবানবাবুর আত্মহত্যা নিয়ে খোঁজ করতে গিয়ে একটা ব্যাপারে আমার খটকা লাগে, যিনি আত্মহত্যা করবেন, বোতলে ওষুধ ঢালতে যাবেন কেন? গ্লাসে ঢাললেই তো কাজ মিটে যায়। তখন থেকেই আত্মহত্যাটাকে আমার হত্যা মনে হয়েছে। বিনায়ক যদিও আপনাকে ট্যাবলেটগুলো ফেলতে দেখেনি। সে দেখেছিল, অচৈতন্য সত্যবানবাবুর প্রতি দৃক্‌পাত না করে, সারা ফ্ল্যাট ওলটপালট করে কী যেন খুঁজছেন আপনি। বিনায়ক যে আপনাকে দেখে নিয়েছে, অচিরেই টের পান। এবং খুব দ্রুত টাকা খাইয়ে তাকে বশ করেন। বিনায়কের যে অবস্থা হঠাৎ ফিরেছে, লক্ষ্মীকে আলাদা জেরা করে তা জানতে পারি। বিনায়কই আপনাকে ও বাড়ির চাবিগুলোর ডুপ্লিকেট করে দিয়েছে। আমরা যে তদন্তে নেমেছি, আমাদের গাড়ির নম্বর সেই আপনাকে দিয়েছিল। মোটর ভেহিকল্‌সে গাড়ির নম্বর দিয়ে আমাদের বাড়ির ফোন নম্বর জোগাড় করেন আপনি। ফোনে হুমকিও দেন। আমাদের ভড়কে দিতে অপরাজিতা দেবীর পাওয়া চিঠির মতো একটা চিঠি দেখান। যেটা নাকি আপনি পেয়েছেন। আপনার সমস্ত পরিকল্পনা নিখুঁত ছিল। ভুল একটাই, ঘুমের ট্যাবলেটের ফয়েলটা আপনি বাবার ওষুধের ড্রয়ারে ফেলে যান। ভেবেছিলেন কারও সন্দেহ হবে না। আমি যখন থানায় গিয়ে জানতে পারি লো-প্রেশারের রুগি সত্যবানবাবুর কাছে ওই ওষুধ বিষবৎ, তৎক্ষণাৎ সত্যবানবাবুর ঘরে ফিরে গিয়ে ফয়েলটা নিয়ে থানায় জমা দিই। ওটা এখন ফরেনসিকে। আশা করি ওতে আপনার হাতের ছাপই পাওয়া যাবে।"

দীপকাকুর একটানা কথায় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়লেন জয়ন্ত মিত্র। কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "বিশ্বাস করুন, আমি বাবাকে মারতে চাইনি। কিছুক্ষণ ঘুম পাড়াতে চেয়েছিলাম। সেই গ্যাপে ঘরটা খুঁজে দেখার ইচ্ছে ছিল। জিনিসটা তো পেলামই না, বাবাও ওষুধটা সহ্য করতে পারলেন না। এই দুর্ঘটনার জন্য বাবাও অনেকাংশে দায়ী। বহুবার জিনিসটা আমি বাবার কাছে চেয়েছিলাম। উনি ওটার অস্তিত্ব স্বীকার করেননি।"

"জিনিসটা যে বাবার কাছে আছে, আপনি কীভাবে জানলেন?" জিজ্ঞেস করেন দীপকাকু।

জয়ন্তবাবু বলেন, "বাবা মিশর থেকে ফিরে আসার পর কলকাতায় একপ্রকার আত্মগোপন করেন। আমার কাছে হঠাৎই একদিন কায়রো থেকে ফোন আসে। একজন বিদেশির ফোন। ইংরেজিতে কথা বলছিল। সে জানায়, আমার বাবা নাকি অসৎ উপায়ে একটা দুর্মূল্য জিনিস হাতিয়ে ভারতে পালিয়ে এসেছেন। জিনিসটা যদি তাকে আমি দিতে পারি, সে আমায় পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবে। লোকটা বোধহয় ততটা বড়মাপের অপরাধী নয়। না হলে সে অনায়াসে ভারতের গুণ্ডা হাত করে কাজটা সারতে পারত। আবার এটাও ঠিক, আমি যত সহজে বাবার কাছাকাছি পৌঁছতে পারব, ওরা পারবে না। দিন পনেরো পরে আবার ফোন করে লোকটা। টাকার অঙ্ক বাড়ায়। আরও বেশ কয়েকবার ফোন করেছে, এখন দাম দাঁড়িয়েছে দেড় কোটি।"

পোড়ামাটির টালির এত দাম! জিনিসটা যদি ঝিনুকের হাতে থাকত, দাম শোনার পর নির্ঘাত হাত থেকে পড়ে যেত। দীপকাকু কিন্তু অবিচল। আবার প্রশ্ন করেন, "আপনি কী করে আন্দাজ করলেন, জিনিসটা অপরাজিতা দেবীর কাছে আছে?"

"বিনায়ক খবরটা দেয়। সে নাকি দেখেছে, এই মাটির ট্যাবলেট আর বই নিয়ে সারারাত জেগে কাটিয়ে দেন বাড়ির মালকিন। জিনিসটা তারপর কোথায় লুকিয়ে রাখেন, জানতে পারেনি বিনায়ক। বাবার মৃত্যুর পর নীচের ঘরে ঢুকে বাবার বই নিয়ে আসতেন অপরাজিতা দেবী। উনিও নিশ্চয়ই জানতে চাইছিলেন জিনিসটার প্রকৃত দাম।"

জয়ন্ত মিত্রর কথার শেষে দীপকাকু বলেন, "আপনার একবারও জানার ইচ্ছে হয়নি, বিদেশি লোকটা জিনিসটার জন্য কেন এত দাম দিতে চাইছে, কী আছে এতে?"

"না। টাকাটাই আমার কাছে বেশি প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে।" জয়ন্ত মিত্রর সোজাসাপটা জবাব।

পুলিশ অফিসার দেরি না করে অ্যারেস্ট করলেন জয়ন্ত মিত্রকে। দীপকাকু ছোট্ট একটা পারমিশন নিলেন অফিসারের থেকে, পোড়ামাটির টালিটা আপাতত নিজের কাছেই রাখতে চান তিনি। এর রহস্যটুকু ভেদ করে জিনিসটা তিনি ফেরত দেবেন। অফিসার সাগ্রহে রাজি হন।

থানায় লাগেজ রেখে ঝিনুক, দীপকাকু এখন ট্যাক্সিতে। চলেছে মাটিগাড়ায়। জিনিসটা হাতে পাওয়ার পর দীপকাকু কলকাতায় তাঁর এক পরিচিতকে ফোন করেন। সুমিত ঘোষ। যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে হিস্ট্রি পড়ান। তাঁর কাছে দীপকাকু জানতে চান, বাণমুখ লিপি পড়তে পারার মতো লোক কলকাতায় কে আছেন।

দু'একজনের নাম করার পর সুমিত ঘোষের হঠাৎ মনে পড়ে নিজের স্যারের কথা। এবং সবচেয়ে যেটা সৌভাগ্যের, সেই শিক্ষক রিটায়ারমেন্টের পর শিলিগুড়িতেই থাকেন। নাম জীবনময় গুপ্ত। বানমুখ লিপি নিয়ে প্রচুর রিসার্চ করেছেন, বিদেশেও গেছেন বেশ

https://boierpathshala.blogspot.com

কয়েকবার। শিলিগুড়ির মাটিগাড়া অঞ্চলে বাড়ি কিনে প্রায় একা অবসর জীবন কাটাচ্ছেন। ভদ্রলোক নাকি ভীষণ মুডি, বুঝে-শুনে কথা চালাতে হবে। জীবনময় গুপ্তর ঠিকানা জেনে নিয়ে ঝিনুকরা ট্যাক্সি ধরেছে। দীপকাকুর হাতে খবরের কাগজে মোড়া সেই পোড়ামাটির ট্যাবলেট। কত হাজার বছরের পুরনো, কে জানে!

ট্যাক্সিতে দীপকাকু বলে উঠেছিলেন, "ভাবতে পারো, এই বাণমুখ লিপিগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে প্রত্নযুগের কোনও এক রানির কান্না। যার প্রায় অনেকটাই উদ্ধার করেছিলেন সত্যবান মিত্র। এত বড় একটা আবিষ্কারের পর বেশ বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন তিনি। জিনিসটা যেহেতু অসৎ উপায়ে হাতিয়েছিলেন, সরকারের কাছে জমা দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছিলেন। ওদিকে বড় ছেলে জেনে গেছে জিনিসটার অস্তিত্ব। বারবার চাইতে আসছে। সত্যবান মিত্র জিনিসটা নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখেন। এ কথাও তিনি ডায়েরিতে লেখেন। নিরাপদ স্থানটি হচ্ছে অপরাজিতা দেবী। যদিও এ ব্যাপারেও তাঁর সংশয় ছিল, তাই ডায়েরিতে লিখেছেন, 'নিরাপদ কি?'"

ডায়েরির সব লেখারই মানে বেরিয়ে এসেছে, শুধু একটা মন্তব্য ছাড়া, 'চায়ে বিস্কুট ডুবিয়ে যে খায়, তার মনের গভীরতা কম'। কার উদ্দেশে লেখা, এখনও বোঝা যায়নি। হয়তো মজা করেই লেখা। দীপকাকুর অনুসন্ধান পর্বের কয়েকটা জায়গা ঝিনুকের অজানা ছিল, গাড়িতে আসতে-আসতে সেটুকুও জেনে নিয়েছে। সত্যবানবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে অপরাজিতা দেবীর কেসের সম্পর্ক রয়েছে, এটা আবিষ্কার হয় অপরাজিতা দেবীর বুক শেল্‌ফে সত্যবানবাবুর নাম লেখা কিছু বই দেখে। বইগুলো বেশিরভাগই মিশরের ইতিহাস এবং ওই সময়ের ভাষাতত্ত্বের উপর। বইগুলো সত্যবানবাবু নিজে দেননি। উনি মারা যাওয়ার পর অপরাজিতা দেবী সত্যবানবাবুর ঘর থেকে নিয়ে এসেছিলেন। জয়ন্তবাবুর কথাতে তার সমর্থন মিলেছে। এর পরের অনুসন্ধান পর্বটি চমকপ্রদ, অপরাজিতা দেবীকে দেওয়া হুমকির চিঠিগুলোতে দুর্গা ফন্ট লক্ষ করা ছাড়াও আর একটা জিনিস আতস কাচ দিয়ে দেখেছিলেন দীপকাকু, বন্ডপেপারের উপর আবছা স্ক্যাচ। একই দাগ পেয়েছিলেন জয়ন্ত মিত্রর পাওয়া চিঠিতে। জয়ন্ত মিত্রর অফিসে ইচ্ছে করেই চায়ের কাপ ফেলে দেন দীপকাকু। গোলমালের মাঝে জয়ন্ত মিত্রর কম্পিউটারের প্রিন্টার থেকে ছাপা একটা পাতা তুলে নেন। হোটেলে খেতে বসে সেই কাগজে একই দাগ আবিষ্কার হতে দীপকাকু বলে উঠেছিলেন, 'আমার সঙ্গে চালাকি!' অর্থাৎ ইমপ্রেশনে ছাপানো চিঠি ছাড়া বাকি সব জয়ন্তবাবুর কম্পিউটার থেকে বেরিয়েছে।

শুধু একবারই জয়ন্ত মিত্র অনেকক্ষণ দীপকাকুকে বোকা বানিয়েছেন। ট্রেনপথে। ছদ্মবেশ নিখুঁত ছিল। ভোরবেলা ভদ্রলোকের পা দেখে দীপকাকুর প্রথম সন্দেহ হয়, মুখের তুলনায় পা অনেক ইয়াং। সন্দেহটা নিশ্চিত করতে ভদ্রলোকের কাছে ম্যাগাজিন চেয়েছিলেন দীপকাকু। তখনই ভদ্রলোকের আঙুলে মা কালীর আংটি দেখে জয়ন্ত মিত্রকে চিনতে পারেন। ম্যাগাজিনে চোখ বোলাতে না-বোলাতেই জয়ন্ত মিত্র কাজটা সারেন। জয়ন্ত মিত্র শিওর ছিলেন জিনিসটা অপরাজিতা দেবীর টয়লেট ব্যাগেই আছে, কারণ ট্যাবলেটের সাইজ জয়ন্তবাবুর জানা ছিল। দীপকাকুর কাছে অজানা। এখন শুধু বাকি রইল পোড়ামাটির ট্যাবলেটটা কত পুরনো এবং কী লেখা আছে ওতে, সেটা জানা।

বসতি ক্রমশ ফাঁকা হচ্ছে। রাস্তা কিন্তু একইরকম চওড়া আর মসৃণ। জায়গাটার সঙ্গে সল্ট লেকের বেশ মিল আছে। হাইওয়ে ছেড়ে গাড়ি ঢুকে পড়ল পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে পাড়ায়। বেশিরভাগই বাগানসমেত একতলা বাড়ি। এ রাস্তা, ও রাস্তা ঘুরে ট্যাক্সি পৌঁছল পাড়ার শেষ প্রান্তে একটা বিশাল বাগানঅলা একতলা বাড়ির গেটে। থামের উপর বড়-বড় অক্ষরে জীবনময় গুপ্তর নাম লেখা।

দীপকাকু, কেন কে জানে, তখনই গাড়ি থেকে না নেমে ড্রাইভারকে ট্যাক্সিটা পিছোতে বললেন। অনেকটা পিছিয়ে আসার পর গাড়ি থেকে নেমে ভাড়া মেটানো হল। কারণটা জানতে চাইতে, দীপকাকু আঙুল তুলে জীবনময় গুপ্তর বাগানটা দেখালেন। সেখানে একটা সুমো গাড়ি দাঁড়িয়ে। দীপকাকু বললেন, "গাড়িটা চিনতে পারছ?"

মাথা নাড়ে ঝিনুক। দীপকাকু বলেন, "অভয়বাবুর গাড়ি। একই নম্বর। যে গাড়িতে অপরাজিতা দেবীকে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে নিয়ে যান অভয়বাবু।"

"অভয়বাবু এখানে কী করছেন?" অবাক হয়ে জানতে চায় ঝিনুক।

দীপকাকু বলেন, "অভয়বাবু না অন্য কেউ, সেটা জানার জন্য আমাদের পাঁচিল টপকাতে হবে। চলো, বাড়ির পিছনের দিকে যাই।"

পাঁচিল ডিঙিয়ে ঝিনুকরা পৌঁছে গেছে জীবনময় গুপ্তর স্টাডিরুমের জানলায়। ঘরটা বাগানের পাশে। জানলার পাল্লাগুলো অল্প ফাঁক করা। তার মধ্যে দিয়ে দেখা গেল অপরাজিতা দেবীকে। চেয়ারে বসে আছেন, হতাশ ভঙ্গি। টেবিলের ও প্রান্তে রাগত আচরণে পায়চারি করছেন জীবনময় গুপ্ত। হাতে ধরা আছে একটা কাগজ। ছোটখাটো চেহারা জীবনময় গুপ্তর। বয়স নিশ্চয়ই সত্তর পেরিয়ে গেছে। মাথায় পাকা এলোমেলো লম্বা চুল। চোখেমুখে প্রখর জ্ঞানের ছাপ।

দীপকাকু ঝিনুকের কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন, "অপরাজিতা দেবী মনে হচ্ছে ডক্টর গুপ্তর ছাত্রী ছিলেন। জীবন স্যারের হাতে যে কাগজটা দেখছ, যতদূর মনে হয় মাটির ট্যাবলেটের প্রতিলিপি।"

দীপকাকুর কথা অক্ষরে-অক্ষরে মিলে গেল। পায়চারি থামিয়ে ডক্টর গুপ্ত হঠাৎ অপরাজিতা দেবীর উদ্দেশে বলে উঠলেন, "এই কপিটাই তো তুমি আমার কাছে পোস্ট করে দিতে পারতে। তা হলে ইতিহাসের ওই দুর্লভ জিনিসটা এভাবে খোয়া যেত না।"

উত্তরে অপরাজিতা দেবী বলেন, "আমি আসলে সেটুকু ঝুঁকিও নিতে চাইনি। এমনিতে কোনও একজন জেনে গিয়েছিল জিনিসটা আমার কাছে আছে। বারবার হুমকির চিঠি দিচ্ছিল। শেষমেশ অবশ্য তারই জিত হল।"

আবার পায়চারি শুরু করলেন ডক্টর গুপ্ত। হাঁটতে-হাঁটতেই কথা চালাতে লাগলেন, "তুমি বলছ সত্যবান মিত্র তোমার বাড়িতে ভাড়া উঠেছিল। এ কি সেই সত্যবান যে কলেজ লাইফে চায়ে বিস্কুট ডুবিয়ে খেত, আমরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা করতাম। তুমি কখনও তাকে সামনে বসে চা খাইয়েছ?"

অপরাজিতা বলে ওঠেন, "আপনি ঠিকই ধরেছেন, ভদ্রলোক চায়ে বিস্কুট ডুবিয়ে খেতেন।"

একইসঙ্গে ঝিনুক বুঝতে পারে ডায়েরির এখন অবধি অজানা মন্তব্যটি নিজের প্রতিই করেছিলেন সত্যবানবাবু। রসিক মানুষ ছিলেন বলতে হবে! ঝিনুক ক্রমশ ধৈর্য হারাচ্ছে, পোড়ামাটির টালিতে কী লেখা আছে, এখনও পর্যন্ত জানা যাচ্ছে না। ঝিনুকের প্রশ্নটা অপরাজিতা দেবীই করে বসেন, "স্যার, ওটাতে কী লেখা আছে?"

"সেটা জেনে এখন আর কী হবে! সত্যবানটাও এমন ইডিয়ট, জিনিসটা পেয়েও নিজের কাছে আটকে রাখল। এটা এক ধরনের স্বার্থপরতা। অগভীর মনের পরিচয়। আমি নিশ্চিত ও এই লিপির পুরোটাই পাঠোদ্ধার করতে পেরেছিল।" বলে একটু থামলেন ডক্টর গুপ্ত। চেয়ারে গিয়ে বসলেন। অপরাজিতা দেবীর দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি ওই জিনিসটা নিয়ে কী করবে ভেবেছিলে?"

উত্তরে অপরাজিতা দেবী বলেন, "কিছুই ভাবিনি। জিনিসটা কতটা অমূল্য জানার জন্যই তো আপনার কাছে নিয়ে আসছিলাম।"

"তা হলে শোনো, শুনলেই বুঝতে পারবে, কী দুষ্প্রাপ্য বস্তু তোমার বোকামিতে হাত থেকে বেরিয়ে গেছে।" বলে টেবিলে রাখা গ্লাস

https://boierpathshala.blogspot.com

থেকে জল খেলেন জীবনময় গুপ্ত। তারপর বলতে শুরু করলেন, "ওই পোড়ামাটির ট্যাবলেটে লেখা ছিল একটা করুণ চিঠি। তুতানখামেনের মাত্র সতেরো অথবা আঠারো বছর বয়সে মৃত্যু হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে তুতেনখামেনের কোনও সন্তান ছিল না। পরে রাজা হওয়ার দাবিদার ছিলেন ষাট বছরের বৃদ্ধ সামন্তরাজা আই। অত্যন্ত কুচক্রী বাজে লোক। এদিকে মিশরীয় রীতি অনুসারে নতুন রাজা, পুরনো রাজার স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারেন। স্বামীর শোকে মুহ্যমান আঁখেসোনামুনের মনে তখন আর এক আতঙ্ক, বুড়ো রাজা আইকে বিয়ে করতে হবে। সত্তর দিনের অশৌচ চলাকালীন রানি এক দুঃসাহসিক কাজ করেন, দূত মারফত নিকটবর্তী দেশ হিত্তি রাজ্যের রাজাকে একটা চিঠি পাঠালেন। তাতে লেখা ছিল, 'অমি মিশরের সদ্য বিধবা রানি। কোনও সন্তানাদি নেই। আপনি যদি আপনার কোনও এক পুত্রকে মিশরে পাঠিয়ে দেন, তাকে আমি বিয়ে করব, সেই হবে মিশরের রাজা'।

"মিশরের রাজধানী তখন থিব্‌স। হিত্তির রাজধানী হাট্টুসাস। দু'টি শহরের দূরত্ব সাতশো মাইল। তখনকার দিনে কীভাবে অতদূর চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন সেটাই আশ্চর্যের।

"সে যাই হোক, হিত্তিরাজ তো চিঠি পড়ে হতভম্ব। কোনও রানি এরকম নির্লজ্জ বিবাহপ্রস্তাব দিতে পারেন, তিনি ভাবতেই পারেন না। মনে হয়, এটা নিশ্চয়ই তাঁকে বোকা বানানোর প্রচেষ্টা। মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে মিটিং-এ বসলেন। মিশরে ভালমতো খোঁজ নেওয়ার জন্য দূত পাঠানো হল। দূত ফিরে এল রানির দ্বিতীয় চিঠি নিয়ে। তাতে লেখা হয়েছে, 'আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। আমার কোনও সন্তান থাকলে কোনও সমস্যাই হত না। সেই হত মিশরের রাজা। কিন্তু এখন আমায় অধীনস্থ দাসকেই বিয়ে করতে হবে। যা আমার পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক। শুনেছি আপনার বেশ ক'টি সুপুত্র আছে, তাদের একজনকে আমায় গ্রহণ করতে বলুন। সেই হবে মিশরের রাজা'। এই দুটো চিঠি ১৯০৭ সালে তুরস্কের বোঘাজকোই গ্রামে খননকার্যের সময় পাওয়া যায়। জার্মান প্রত্নবিদ হুগো ভিঙ্কলে চিঠি দুটি আবিষ্কার করেন। তোমার কাছে ছিল সম্ভবত তৃতীয় চিঠি, যেটা এতদিন ইতিহাসের কাছে অজ্ঞাত ছিল।"

এত প্রাঞ্জলভাবে কথাগুলো বলছেন ডক্টর গুপ্ত, পুরনো মিশরটাই যেন চোখের সামনে ফুটে উঠছে ঝিনুকের। ইচ্ছে করছে ঘরে ঢুকে পড়ে, বাকিটা শোনে। উপায় নেই। দীপকাকুও গভীর মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনছেন। জীবনবাবু আবার বলতে শুরু করেন, "দ্বিতীয় চিঠি পড়ে হিত্তিরাজ নিঃসন্দেহ হন। তাড়াতাড়ি তিনি তাঁর এক ছেলেকে মিশরে পাঠিয়েছিলেন। রাজপুত্রটি মিশরের সীমানা পেরোতেই গোপন আততায়ীর হাতে খুন হয়।

"মিশরের সেনাপতি হোরেমহাব চিঠি চালাচালির ব্যাপারটা টের পেয়েছিলেন। তোমার কাছে যে চিঠিটা ছিল, তাতে রানি সম্ভবত সতর্ক করেছিলেন রাজপুত্রকে। অন্য পথে আসার নির্দেশ দেওয়া ছিল মনে হচ্ছে। চিঠিটা লোপাট হওয়ার জন্যই রাজপুত্র কোনওদিনই আঁখেসোনামুনের কাছে পৌঁছতে পারেনি। সেই চিঠি তোমার মুর্খামির জন্য তিনহাজার বছর পর আবার হারিয়ে গেল। চিঠিটার নিশ্চিত পাঠোদ্ধার আমার পক্ষে কতটা সম্ভব হত জানি না। বিদেশি বিশেষজ্ঞদের হাতে তুলে দিতাম।"

জানলায় দাঁড়িয়ে ঝিনুক একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ দেখে ডক্টর গুপ্তর স্টাডিতে ঢুকছেন দীপকাকু! কখন যে পাশ থেকে সরে গেছেন, টেরই পায়নি। ঝিনুক প্রায় দৌড়ে ডক্টর গুপ্তর ঘরে ঢোকে। দীপকাকু বলছেন, "মাস্টারমশাই, জিনিসটা হারায়নি। অনেক কষ্টে মাটির ট্যাবলেটটা আমি রক্ষা করেছি।"

হঠাৎ দীপকাকু কোথা থেকে উদয় হলেন, কী তাঁর পরিচয়? সে সবের ধার দিয়েই গেলেন না জীবনময় গুপ্ত। দীপকাকুর হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিলেন কাগজে মোড়া মাটির ট্যাবলেট। টেবিলের উপর রেখে এমনভাবে দেখছেন, যেন তিনহাজার বছর পূর্বে থিব্‌সের রাজপ্রাসাদের কোনও এক গোপন কুঠুরিতে টর্চের আলো ফেলছেন।

অপরাজিতা দেবী লজ্জায় মাথা তুলতে পারছেন না। দু'জনকেই বিরক্ত না করে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন দীপকাকু। মোবাইল ফোন মারফত শিলিগুড়ি পুলিশকে জীবনময় গুপ্তর বাড়িতে আসতে বললেন। ডক্টর গুপ্তই জানাবেন জিনিসটার গুরুত্ব।

ঝিনুকরা ডক্টর গুপ্তর বাড়ি, বাগান ঘুরে দেখছিল, মিনিট দশেকের মধ্যেই জিপ নিয়ে পুলিশ হাজির। পিছনে আর একটা গাড়ি। টিভি কোম্পানির। আজকাল সব বড় শহরে টিভি চ্যানেলের লোক রাখা থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই টিভির লোক, পুলিশে ছয়লাপ হয়ে গেল গোটা বাড়ি। এদিকে দীপকাকু বেপাত্তা। ঝিনুকের সামনেই চলে এল টিভি ক্যামেরা। রিপোর্টার বললেন, "তুমিই তো গোটা অভিযানে দীপঙ্কর বাগচীর সঙ্গে ছিলে?"

সলজ্জভাবে ঘাড় হেলায় ঝিনুক।

পরের প্রশ্ন, "দীপঙ্করবাবু কোথায়?"

"আছেন হয়তো আশপাশে।" বলে ঝিনুক।

আবার প্রশ্ন, "তোমার নাম?"

ডাকনামটা বলতে গিয়েও চেপে যায় ঝিনুক। টিভি, কাগজে ভাল নামটাই যাওয়া উচিত। বলে, "আঁখি সেন।"

"মিশরের কোনও এক রানির চিঠি উদ্ধার করেছ তোমরা। রানির নাম কী?"

"আঁখেসোনামুন," বলার সঙ্গে-সঙ্গে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে ঝিনুকের, নিজের ভাল নামের সঙ্গে কী আশ্চর্য মিল! গলা আটকে আসছে ঝিনুকের, বাকিটা গুছিয়ে বলতে পারবে তো?

---

*কাহিনিতে কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে আমার কল্পনা মিশেছে।*
*ঐতিহাসিক তথ্যগুলির জন্য আমি সুবোধকুমার মজুমদারের কাছে কৃতজ্ঞ।*
*লেখক*

https://boierpathshala.blogspot.com